মিলিয়াছে। কি মধুর ভাব! কি মধুর কবিত্ব! আকাশের মেঘগুলি (কেন বলিতে পারি না) মধ্যে মধ্যে চাঁদের মুখের পরে ঢাকা দেয়. পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। ছুইটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ছুই ভগ্নী কিয়ৎকালের জন্য অশ্রুভরা চোখে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গার ধারে দাঁড়াইলে শ্মশানের মাধুরী কেন মনে উদয় হয়? আমি এই পুলের ধারে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নায় শ্মশানের চিতাধূম দেখিতেছি। তুমি হয়ত কঙ্কাল মড়ার মাথা দেখিয়া বলিবে যে ইহাতে আবার মাধুর্য্য কোথায়? কিন্তু শ্মশানদৃশ্যে যে মাধুর্য্য আছে লোকালয় দৃশ্যেও সেরূপ মাধুর্য্য আছে কি না সন্দেহ। মনে কর দেখি যে যখন গভীর নিশীথে চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ ভাবের মধ্যে নিশীথিনীর ঘোর অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া "হরিবোল" শব্দের সহিত একটা চিতা শবসমেত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে আর চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র কঙ্কাল এক ভয়ানক গম্ভীরস্বরে বলিতেছে "আয়"—সমস্ত শ্মশান ভূমি তাহার সুদীর্ঘ শুষ্ক বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া মেদিনীর গভীর অভ্যন্তর হইতে ডাকিতেছে "আয় আয়"—তখন তুমি একলা যদি সেই শ্মশানে বসিয়া থাক তাহা হইলে তোমার মনে একটী গম্ভীর ভাবের অস্পষ্ট ছায়া পড়ে কি না! সেই যে অস্পষ্ট ভাবের ছায়া পড়ে তাহাতেই তুমি মাধুর্য্য দেখিতে পাইবে—বালক বালিকার পুতুল খেলা দেখিতে পাইবে। কি মজার খেলা! এই আজ আসিলাম কাল হাসিলাম, একবার কাঁদিলাম আর এক বৃহৎ সমুদ্রে গা ভাসাইয়া দিলাম। দিয়া কোথায় চলিলাম? কে জানে। সবই যেন খেলা আবার সবই যেন সত্য। সবই যেন মধুর আবার সবই যেন ম্লান। সবেতেই যেন গাম্ভীর্য্য আবার সকলেতেই যেন অট্টহাসি। অভিনয় অভিনয় এ জগতের সবই অভিনয়—না সব সত্য ঘটনা। অভিনয় কোথায়! সব ছেলেখেলা—না তাহাও নহে এ ছেলেখেলা নয়। তবে কি! কিছুই না আবার সবই। এ যেন একটা মস্ত হাসি আবার এ যেন একটা মস্ত কান্না। এ কি পাগলামি! না তাহাও নহে। এই এক মজা—হাস কাঁদ।

* * * *

পুলটার যেন এই কয় ঘণ্টার মধ্যে একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। তাহার উপর দিয়া যেন একটা পরিবর্ত্তনের ঝড় বহিয়া গিয়াছে—একটা ফরাসী বিপ্লব গোছ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তুমি বিশ্বাস করিবে না বলিবে যে এ কোন গুলির আড্ডার কথা আগাগোড়া নেশার ঝোঁকে লেখা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এ কোনও গুলির আড্ডার কথা নহে। জগতের বৃহৎ ইতিহাসের একজায়গায় খুলিয়া দেখ আমি যাহা যাহা বলিলাম সমস্তই দেখিতে পাইবে। শুদ্ধ তাহাই নহে, আমি যে এই এখানে বসিয়া লিখিতেছি—কলমদেবের কমল চরণে অবিরাম কালি অঞ্জলি দিতেছি তাহাও সেই বৃহৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা আছে। আমার এই লেখার প্রতি অক্ষর সেই ইতি-

হাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবে। আর আমার এ লেখার যে আগাগোড়া সব সত্য তাহারও পরিচয় পাইবে। গভীর নিশীথে চন্দ্রের সেই যে শোভা দেখিয়াছিলাম এখন আর তাহা নাই—সেই যে প্রেমের মিলন দেখিয়াছি তাহা এখনও আছে কিন্তু সে প্রেমের জ্যোতি যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। চাঁদের মুখ যেন শুকাইয়া আসিয়াছে। রজনী উষার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া অগাধ নিদ্রায় মগ্ন। তাহার কালো চুলগুলি আলুথালু হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার মুখের উপর উষার স্নেহ দৃষ্টি ও শুভ্র কান্তি-চ্ছটা পড়িয়াছে। গঙ্গা নিয়মিত কাজ করিয়া যাইতেছে কিন্তু সে জ্যোৎস্না নাই। গঙ্গা এখন জলেরই গঙ্গা—জ্যোৎস্নার নয়। এ কি কম বিপ্লব! কোথায় গেল সেই সব আকাশভরা তারা, কোথায় গেল চাঁদ! কোথা হইতে চোখ রাঙাইয়া সূর্য্য উঠিল! আমি পুলের ধারে এই ক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া আছি ইতি মধ্যে কখন্ পৃথিবীটা ঘুরিয়া গেছে—আকাশের গ্রহ তারকারা কে কোথায় সরিয়া গেছে—কেবল আমি আর এই সহস্র চরণ বিশিষ্ট হাবড়ার পুল এক জায়গায় খাড়া দাঁড়াইয়া আছি। প্রতি দিনই এক রাত্রির মধ্যে এত বড় বড় বিপ্লব ঘটিয়া যায়, অথচ আমরা তখন কেমন আরামে ঘুমাইয়া থাকি জানিতেই পাই না, আমাদের সে জন্য কিছু চিন্তা করিতেই হয় না।

পুলের শেষে জনকতক লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন পরমানন্দে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তামাকু টানিতেছে। পাহারাওয়ালা বেচারী নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভদ্রলোক গুঁতাইতে না পারার দুঃখে গান ধরিয়াছে। একজন সাহেব দুইটা ঘোড়া লইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আলো সম্পূর্ণ হয় নাই কিন্তু আর দেরিও নাই। অসংখ্য মাড়োয়ারি গঙ্গার ধারে বসিয়া বসিয়া "সীতারাম" করিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ মুরারি" ও "রাধাকৃষ্ণ" ধ্বনি তাহাদের কর্ণ-কুহরে গিয়া বজ্রের ন্যায় আঘাত করিতেছে। মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা কেহ গানে, কেহ পূজায়, কেহ স্নানে, আর কেহ পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্তা। পুরুষেরা কাপড় নিংড়াইতে নিংড়াইতে অনেকে গান করিতেছে, কেহ লাউরূপী ভুঁড়িটী বাহির করিয়া দিয়া মুরুব্বির ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, কেহ উপবীত পরিষ্কার করিতে করিতে স্নান করিতেছে, আর কেহ কেহ (বলিতে সাহস হয় না) গাঁট কাটিবার সহজ উপায়ের বিষয়ে চিন্তামগ্ন রহি-য়াছেন। পাণ্ডারা গঙ্গার ঘাটে যেন ভারি পরিচিত এই ভাবেই অনেকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। টাকশালের ধারে সারি সারি গাছগুলির বড় শোভা হইয়াছে। একটা ঘাটের পার্শ্বে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের মহা সভা বসিয়াছে। নদীর ধারে বিশ ত্রিশ খানা নৌকা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে। গঙ্গার ধারে মালগাড়ীর জন্য যে রেল পথ আছে তাহার উপরে একটা এঞ্জিন ফোঁস্ ফাঁস্ করিতে করিতে যাইতেছে আর আসিতেছে। একজন দ্বারবান এক অপ্রয়োজনীয় লাঠনের বোঝা বহিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। একটা রোগা খিটখিটে-গোছের খোট্টা আর একজনকে বলিতেছে "আরে মৎ যাও রেল

আতা হ্যায়”। সে “কাঁহা” বলিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠে যতদূর সাধ্য এক চীৎকার ছাড়িয়া আপনাকে পরমবীরপুরুষ বলিয়া মনে করিতেছে। টাঁকশালের উত্তরপূর্ব্ব কোণে দুইটা পাহারাওয়ালা এক জায়গায় জড় হইয়া ষোলআনা দন্তের ছটা বাহির করিয়া হাস্যরস আস্বাদনে নিযুক্ত! তাহাদের নিকটেই একজন খালাসী গাদাখানেক কয়লা লইয়া অগ্নিশর্ম্মাকে চটাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাস্তার এ ধারে একজন সন্ন্যাসী আগুন জালিয়া বসিয়া আছে এবং লোকের কাছে নিজের পরম সাধুভাব জানাইতে কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পথের ধারে একটা বাড়ীতে “জয়গোবিন্দ” ইত্যাদি গান হইতেছে। আর রতন সরকারের পথে দুইজন লোক ঝগড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। ঝগড়া মুখে মুখেই চলিয়াছে—বাঙ্গালীর হাতে পক্ষাঘাত। মনে মনে বকিতে বকিতে কোথায় আসিলাম! এ যে দেখি আমাদেরই সেই বাড়ী—যে বাড়ীর প্রতি ইট্‌কাঠের সহিত আমাদের কতদিনের স্নেহ প্রেম ভক্তির যোগ আছে। ইহার পুরাতন দেয়ালের ফাটল গুলিও মনে হয় যেন অতীতের স্বহস্তে লিখিত সোনার অক্ষর। গলির মোড়েতেই দেখি না একখানা বেরুশ্ গাড়ী রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর আড়াল ছাড়াইতেই বাড়ীর সমস্ত মুক্ত দ্বারগুলি হইতে যেন শত স্রোতে প্রেমের সম্ভাষণ আসিয়া আমাকে টানিয়া লইল। সে প্রেমের মাধুরী কি বলিব! তাহার জ্যোতিতে আমার মুখমণ্ডল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল, তাহার হাসিতে আমার হাসি মিলাইয়া গেল। সমস্ত জগৎ যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার ছাতে দেয়ালে আশে পাশে অদৃশ্য হইয়া মিশিয়া গেল, বাড়ির বাহিরে আর কিছু বাকি রহিল না।

সংজ্ঞা বিচার।

পৌষ মাসের বালকে উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বাহির করিবার জন্য “হুজুগ,” “ন্যাকামি” এবং “আহ্লাদে” এই তিনটি শব্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম পাঠকদের নিকট হইতে অনেকগুলি সংজ্ঞা আমাদের হাতে আসিয়াছে।

কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রচলিত। আমরা পরস্পর কথোপকথনে ঐ কথাগুলি যখন ব্যবহার করি তখন কাহারও বুঝিবার ভুল হয় না, অথচ স্পষ্ট করিয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বলিয়া থাকেন। ইহা হইতে এমন বুঝাইতেছে না যে বাস্তবিকই ঐ কথাগুলির ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া থাকেন—কারণ, তাহা হইলে ত ও কথা লইয়া কোন কাজই চলিত না। প্রকৃত কথা এই, আমরা অনেক জিনিষ

বুঝিয়া থাকি, কিন্তু কি বুঝিলাম সেটা ভাল করিয়া বুঝিতে অনেক চিন্তা আবশ্যক করে। যেমন, আমরা অনেকে সহজেই সাঁতার দিতে পারি কিন্তু কি উপায়ে সাঁতার দিতেছি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। অথবা—একজন মানুষ রাগিলে তাহার মুখ-ভঙ্গী দেখিলে আমরা সহজেই বলিতে পারি মানুষটা রাগিয়াছে কিন্তু আমি যদি পাঁচজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বল দেখি রাগিলে মানুষের মুখের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, মুখের কোন্ কোন্ মাংসপেশীর কিরূপ বিকার হয়, মুখের কোন অংশের কিরূপ অবস্থান্তর হয়, তাহা হইলে পাঁচজনের বর্ণনায় প্রভেদ লক্ষিত হইবে—অথচ ক্রুদ্ধ মনুষ্যকে দেখিলেই পাঁচজনে বিনা মতভেদে সমস্বরে বলিয়া উঠিবে লোকটা ভারি চটিয়া উঠিয়াছে। পাঠকদের নিকট হইতে যে সকল সংজ্ঞা পাইয়াছি তাহার কতকগুলি এইস্থানে পরে পরে আলোচনা করিয়া দেখিলেই পরস্পরের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যাইবে।

একজন বলিতেছেন "হুজুক—জনসাধারণের হৃদয়োন্মাদক আন্দোলন।" তা যদি হয়, ত বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু, ক্রমোয়েল, ওয়াশিংটন প্রভৃতি সকলেই হুজুক করিয়াছিলেন! কিন্তু লেখক কখনই সচরাচর কথোপকথনে এরূপ অর্থে হুজুক ব্যবহার করেন না।

ইনিই বলিতেছেন "ন্যাকামী—অভিমানবশত কিছুতে অনিচ্ছা প্রকাশ—অথবা ইচ্ছা-সত্ত্বে অভিমানীর অনিচ্ছা প্রকাশ।"

স্থল বিশেষে অভিমানচ্ছলে কোন ব্যক্তি ন্যাকামী করিতেও পারে কিন্তু তাই বলিয়া অভিমান বশত অনিচ্ছা প্রকাশ করাকেই যে ন্যাকামী বলে তাহা নহে।

"আহ্লাদে" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইনি বলেন "দশ জনের আহ্লাদ পাইয়া অহঙ্কৃত।" প্রশ্রয়প্রাপ্ত অহঙ্কৃত এবং "আহ্লাদে"র মধ্যে যে অনেক প্রভেদ বলাই বাহুল্য।

"হুজুগ" শব্দের নিম্নলিখিত প্রাপ্ত সংজ্ঞাগুলি পরে পরে প্রকাশ করিলাম।—

হুজুগ।

(১) বিস্ময়জনক সংবাদ যাহা সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

(২) অকারণ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহ। (অকারণ শব্দের দুই অর্থ—১ অনির্দ্দিষ্ট। ২—তুচ্ছ, সামান্য)

(৩) অল্পেতে নেচে ওঠার নাম।

(৪) অতিরঞ্জিত জনরব।

(৬) ফল অনিশ্চিত এরূপ বিষয়ে মাতা।

(৭) কোন এক ঘটনা, লোকে যাহার হাপায় পড়ে স্রোতে ভাসে। "বাজার দরে নেচে বেড়ান।" "ঝড়ের আগে ধূলা উড়া।"

(৮) ফস্ কথায় নেচে উঠা।

(৯) দেশব্যাপী কোন নূতন (সত্য এবং মিথ্যা) আন্দোলন।

(১০) বাহাড়ম্বরে মত্ততা।

প্রথম সংজ্ঞাটি যে ঠিক হয় নাই তাহা ব্যক্ত করিয়া বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে লেখক নিজেই "অকারণ" শব্দের যে অর্থ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে। অনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ যাহার লক্ষ্য স্থির হয় নাই এমন কোন তুচ্ছ সামান্য বিষয়কেই বোধ করি তিনি অকারণ বিষয় বলিতেছেন—তাঁহার মতে এইরূপ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহকেই হুজুগ বলে। কেহ যদি বিশেষ উদ্যোগের সহিত একটা বালুকার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া পরমোৎসাহে তাহা আবার ভাঙ্গিতে থাকে তবে তাহাকে হুজুগে বলিবে না পাগল বলিবে?

তৃতীয় সংজ্ঞা। রাম যদি ঘুড়ি উড়াইবার প্রস্তাব শুনিবামাত্র উৎসাহে নাচিয়া উঠে তবে রামকে কি হুজুগে বলিবে?

চতুর্থ সংজ্ঞা। অতিরঞ্জিত জনরবকে যে হুজুগ বলে না তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শ্যাম তাহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে পাঁচ শ টাকা খরচ করিয়াছে লোকে যদি রটায় যে সে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়াছে তবে সেই জনরবকেই কি হুজুগ বলিবে?

পঞ্চম সংজ্ঞা। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে অসম্ভব সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া থাকে—তাহাকে কেহ হুজুগ বলে না।

ষষ্ঠ সংজ্ঞা। লাভ অনিশ্চিত এমনতর ব্যবসায়ে অনেকে অর্থলোভে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন সে রূপ ব্যবসায়কে কেহ হুজুগ বলে না।

সপ্তম। এ সংজ্ঞাটি পরিষ্কার নহে। যে ঘটনার স্রোতে লোকে ভাসিতে থাকে তাহাকে হুজুগ বলা যায় না। তবে—লেখক "হ্যাপা" শব্দ যোগ করিয়া ইহার মধ্যে আরেকটি নূতন ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু "হ্যাপা" শব্দের ঠিক অর্থটি কি সে সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে। অতএব "হুজুগ" শব্দের ন্যায় "হ্যাপা" শব্দও সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ যোগ্য। সুতরাং "হ্যাপা" শব্দের সাহায্যে "হুজুগ শব্দ বোঝাইবার চেষ্টা সঙ্গত হয় না। "বাজার দরে নেচে বেড়ান" "ঝড়ের আগে ধূলা উড়া" দুটি ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট নহে।

অষ্টম। হরি যদি মাধবকে বলে "তুই ট্যাকশালের দাওয়ান হইবি" অমনি যদি মাধব নাচিয়া উঠে তবে মাধবের সেই উৎসাহ উল্লাসকে হুজুগ বলা যায় না।

নবম। আন্দোলন নূতন হইলেই তাহাকে হুজুগ বলা যাইতে পারে না।

দশম। বাহাড়ম্বে মত্ততামাত্রকেই হুজুগ বলিতে পারি না, কোন রায় বাহাদুর যদি তাহার খেতাব ও গাড়ি ঘুড়ি লইয়া মাতিয়া থাকে তবে তাহার সেই মত্ততাকে কি হুজুগ বলা যায়?

আমরা যে লেখককে পুরস্কার দিয়াছি তিনি "হুজুগ" শব্দের নিম্নলিখিত মত ব্যাখ্যা করেন—

'মাথা নাই মাথা ব্যথা' গোছের কতকগুলা নাচুনে জিনিষ লইয়া যে নাচন আরম্ভ হয় সেই নাচনের অবস্থাকেই হুজুগ বলে। বিশেষ কিছুই হয় নাই অথবা অতি সামান্য একটা কিছু হইয়াছে আর সেইটাকে লইয়া সকলে নাচিয়া উঠিয়াছে এই অবস্থার নাম হুজুগ।"—

আমরা দেখিতেছি হুজুগে প্রথমতঃ এমন একটা বিষয় থাকা চাই যাহার প্রতিষ্ঠাভূমি নাই—যাহার ডালপালা খুব বিস্তৃত কিন্তু শিকড়ের দিকের অভাব। মনে কর আমি "সার্ব্বজনীনতা" বা "বিশ্বপ্রেম" প্রচারের জন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি, তাহার কত মন্ত্র তন্ত্র কত অনুষ্ঠান তাহার ঠিক নাই—কিন্তু আমার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকদের প্রতি আমাদের জাত বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে—মূলেই প্রেমের অভাব অথচ প্রেমের অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহার সঙ্গে একটা নাচনের যোগ থাকা চাই, অর্থাৎ কাজের প্রতি ততটা নহে যতটা মত্ততার প্রতি লক্ষ্য। অর্থাৎ হো হা করিয়া বেশ সময় কাটিয়া যাইতেছে, খুব একটা হাঙ্গাম হইতেছে এবং তাহাতেই একটা আনন্দ পাইতেছি। যদি স্থির হইয়া স্তব্ধভাবে কাজ করিতে বল তবে তাহাতে মন লাগে না, কারণ নাচান' এবং নাচা' এই দুটোই মুখ্য আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, কেবল একজনকে লইয়া হুজুগ হয় না—সাধারণকে আবশ্যক—সাধারণকে লইয়া একটা হট্টগোল বাধাইবার চেষ্টা। চতুর্থতঃ হুজুগ কেবল একটা খবরমাত্র রটান' নহে; কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমারোহের সহিত উদ্যোগ করা তার পরে সেটা হউক বা না হউক।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখকের সংজ্ঞা যে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তিনি তাঁহার সংজ্ঞার দুইটি পদকে সংক্ষেপ করিয়া অনায়াসেই একপদে পরিণত করিতে পারিতেন।

সংজ্ঞা রচনা করা যে দুরূহ তাহার প্রধান একটা কারণ এই দেখিতেছি, যে, একটি কথার সহিত অনেকগুলি জটিল ভাব জড়িত হইয়া থাকে লেখকেরা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে তাহার সকল গুলি গুছাইয়া লইতে পারেন না—অনবধানতা দোষে একটা না একটা বাদ পড়িয়া যায়। উদ্ধৃত সংজ্ঞা গুলির মধ্যে পাঠকেরা তাহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন।

ন্যাকামি।

(১) জানিয়া না জানার ভাণ।

(২) জানিয়া না জানার ভাব প্রকাশ করা।

(৩) জেনেও জানি না এই ভাব প্রকাশ করা।

(৪) জানিয়াও না জানার ভাণ।

(৫) অবগত থাকিয়া অজ্ঞতা দেখান।

(৬) বিলক্ষণ জানিয়াও অজ্ঞানতার লক্ষণ প্রকাশ করা।
(৭) বুঝেও নিজেকে অবুঝের ন্যায় প্রতিপন্ন করা।
(৮) সেয়ানা হয়ে বোকা সাজা।
(৯) জেনে শুনে ছেলেমি।
(১০) বুঝে অবুঝ হওয়া। জেনে শুনে হাবা হওয়া।
(১১) ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা এবং মিথ্যা সরলতা।

প্রথম হইতে সপ্তম সংজ্ঞা পর্য্যন্ত সকল গুলির ভাব প্রায় একই রকম। অর্থাৎ সকল গুলিতেই "জানিয়াও না জানার ভাণ" এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু এরূপ ভাবকে অসরলতা, মিথ্যাচরণ, বা কপটতা বলা যায়। কিন্তু কপটতা ও ন্যাকামি ঠিক এক রূপ জিনিষ নহে। অষ্টম সংজ্ঞায় লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় যে বলিয়াছেন, "সেয়ানা হইয়া বোকা সাজা" ইহাই আমার ঠিক বোধ হয়। জানিয়া না জানার ভাব প্রকাশ করিলেই হইবে না, সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে হইবে আমি যেন নির্ব্বোধ, আমার যেন বুঝিবার শক্তিই নাই। ষষ্ঠ এবং সপ্তম সংজ্ঞাতেও কতকটা এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু তেমন স্পষ্ট হয় নাই। নবম ও দশম সংজ্ঞা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু অষ্টম হইতে দশম সংজ্ঞাতে বোকা, ছেলেমি, হাবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এই শব্দ গুলি সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ-যোগ্য। অর্থাৎ হাবামি, বোকামি ও ছেলেমির বিশেষ লক্ষণ কি তাহা মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। এই জন্য একাদশ সংজ্ঞায় লেখক যে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার ভাণের সঙ্গে "মিথ্যা সরলতা" শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে "ন্যাকামি" শব্দের অর্থ পরিষ্কার হইয়াছে। অজ্ঞতা এবং সরলতা উভয়ের ভান থাকিলে তবে ন্যাকামি হইতে পারে। আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক লিখিয়াছেন "ন্যাকামি বলিতে সাধারণতঃ জানিয়া শুনিয়া বোকা সাজার ভাব বুঝায়।" পরে দ্বিতীয় পদে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন "যেন কিছু জানে না যেন কিছু বুঝে না এই ভাবের নাম ন্যাকামী।" "যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না" বলিতে লোকটা যেন নেহাৎ হাবা নিতান্ত খোকা এইরূপ বুঝায়। লোকটা যেন কিছু বুঝেই না, এবং তাহাকে বুঝাইবার উপায়ও নাই।

আহ্লাদে।

(১) স্বার্থের জন্য বিবেচনা রহিত।
(২) যাহারা পরিমাণাধিক আহ্লাদে সর্ব্বদাই মত্ত।
(৩) যে সকল তা'তেই অন্যায়রূপে আমোদ চায়, অথবা যে হক্ না হক্ দাঁত বের করে।
(৪) অযথা আনন্দ বা অভিমান প্রকাশক।
(৫) অন্যকে অসন্তুষ্ট করিয়া যে নিজে হাসে।

(৬) যে সর্ব্বদা আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়।

(৭) কি সময়ে কি অসময়ে যে আহ্লাদ প্রকাশ করে।

(৮) যে অভিমানী অল্পে অধৈর্য্য হয়।

(৯) যে অনুপযুক্ত সময়েও আবদারী।

(১০) সাধের গোপাল নীলমণি।

আমার বোধ হয়—যে ব্যক্তি নিজেকে জগতের আদুরে ছেলে মনে করে তাহাকে আহ্লাদে বলে। প্রশ্রয়দাত্রী মায়ের কাছে আদুরে ছেলেরা যেরূপ ব্যবহার করে যে ব্যক্তি সকল জায়গাতেই কতকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতে যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সময় অসময় পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র আবদার করিতে যায়, সর্ব্বত্রই দাঁত বাহির করে, মনে করে সকলেই তাহার সকল বাড়াবাড়ি মাপ করিবে, সেই আহ্লাদে। তাহাকে কে চায় না চায়, তাহাকে কে কি ভাবে দেখে সে বিষয় বিবেচনা না করিয়া সে ঢুলিতে ঢুলিতে গায়ে পড়িয়া সকলের গা ঘেঁষিয়া বসে, সকলের আদর কাড়িতে চেষ্টা করে। সংজ্ঞা-লেখকগণ অনেকেই "আহ্লাদে" ব্যক্তির একেকটি লক্ষণ মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বলিলে তাহার সকল লক্ষণ ব্যক্ত হয় এমন কোন কথা বলেন নাই। দশম সংজ্ঞাকে ঠিক সংজ্ঞা বলাই যায় না।

যাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে তাঁহার "আহ্লাদে" শব্দের সংজ্ঞা ঠিক হয় নাই। তিনি বলেন "ভাতের ফেনের মত টগ্‌বগে। যাহাদিগের প্রায় সকল কার্য্যেই 'একের মরণ অন্যের আমোদ' কথার সত্যতা প্রমাণ হয় অর্থাৎ তুমি বাঁচ আর মর আমার আ-মোদ হইলেই হইল ইহাই যাহাদিগের মত ও কার্য্য তাহাদিগকেই "আহ্লাদে" বলা যায়।"

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞা লেখক ছুটি সংজ্ঞার উত্তর দিয়াছেন। তৃতীয়টিতে কৃতকার্য্য হন নাই। শ্রীবঃ—বলিয়া তিনি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, বোধ করি নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত। আমরা বলিয়াছিলাম, সংজ্ঞা পাঁচ পদের অধিক না হয়, কেহ কেহ পদ বলিতে শব্দ বুঝিয়াছেন। আমরা ইংরাজি Sentence অর্থে পদ ব্যবহার করিয়াছি।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

জন্তুদিগকে পড়িতে শেখান।

সুবিখ্যাত কুমারী মার্টিনো একদা বলিয়াছিলেন "ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে নিম্ন শ্রেণীস্থ জন্তুদিগের সহিত এত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সহবাসে থাকিয়াও, আমরা তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষতঃ তাহাদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানি না।"

গৃহপালিত জন্তুদের সর্ব্বোপরি কুকুরদের পক্ষে এই কথাগুলি বিশেষ ভাবে খাটে।

"আমার বোধ হয় ইহার কারণ এই যে, এত দিন এই সকল জন্তুর নিকট হইতে কিছু শিখিতে চেষ্টা না করিয়া আমরা কেবল তাহাদিগকে শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছি আমাদের মনের ভাব তাহাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছি। কিন্তু তাহাদের মনের ভাব আমাদের কাছে ব্যক্ত করিতে পারে এমন কোন ভাষা বা চিহ্ন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে মনোযোগী হই নাই। প্রথমোক্ত কাজেতে যে আমাদের কিছু শিখিবার নাই, তা নয়, কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা বহু দূর যাইতে পারি না।

"এমতাবস্থায় আমি ভাবিলাম যে বোবা ও বধির মনুষ্যদিগের জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা কুকুরদের পক্ষে খাটাইলে হয়তঃ ফল লাভ হইতে পারে। তদনুসারে কতকগুলি মজবুদ তাসের কাগজ তৈয়ার করিয়া তদুপরি Food (খাদ্য), Bone (হাড়) Out (বাহির) ইত্যাদি শব্দ স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম। কোন "বধির ও বোবা" স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। আমরা প্রত্যেকে এক একটী টেরিয়র বাচ্ছা লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। কিন্তু তাহাতে কোন সন্তোষজনক ফল ফলিল না। তদনন্তর Van (ভ্যান) নামক একটী শ্যামবর্ণ লোমশ ছোট কুকুরকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা গেল। একটী চা পাত্রে কুকুরটীর খাদ্য রাখিয়া তদুপরি Food (খাদ্য) মুদ্রিত কার্ড, এবং একটী শূন্য চা-পাত্রের উপরি একখানা সাদা কার্ড রাখিয়া দুইটী পাশাপাশি স্থাপন করিলাম। Van অল্প সময়ের মধ্যেই দুই পাত্রের প্রভেদ শিখিল। ইহার পর তাহাকে আমার নিকট এক একখানা কার্ড আনিতে শিখাইলাম। এখন সে তাহা সহজেই করিতে পারে। যখন সে "খাদ্য"-মুদ্রিত কার্ড আনিত তখন তাহাকে খাবার দিতাম; "হাড়" মুদ্রিত কার্ড আনিলে হাড় দিতাম, এবং "বাহির"—মুদ্রিত কার্ড আনিলে বাহিরে লইয়া যাইতাম। সে কখন কখন সাদা কার্ড লইয়া আইসে, কিন্তু আমি তাহার ভুল দেখাইয়া দিলেই, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া আর এক খানা আনয়ন করে। এইরূপ ভুল কদাচিত হয়। কল্য প্রাতে সে বার বার কার্ডের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও "খাদ্য" লিখিত কার্ড আনিয়াছিল।

"তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায় যে Vanএর এই ধারণা যে এই শেষোক্ত কার্ড খানা আনিলেই, সে খাইতে পাইবে। আমার ইহাও বিশ্বাস যে "খাদ্য" কার্ড এবং "বাহির" এই দুইয়ের বিভিন্নতা সে বুঝিতে পারে।

"কার্ডের সংখ্যা বাড়াইলে বোধ হয় এইরূপে কুকুরদের সহিত আমাদের সহজে কথা বার্ত্তা চালাইবার একটী প্রণালী উন্মুক্ত হইতে পারে আমি কেবল মাত্র পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু এই বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান করিতে আমার মনস্থ আছে।"

বিলাতের কোন বিখ্যাত পত্রিকা পড়িতে পড়িতে এই বিষয়টার উপর আমার চক্ষু প্রতিত হইল। ইহা একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের লেখা। *

হ, চ, সি,

পিপীলিকাদিগের আচার ব্যবহার।

আজ দুই তিনমাস হইল উক্ত পণ্ডিত লণ্ডননগরে "পিপীলিকাদের আচার ব্যবহার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা ছিল, তাহার সারমর্ম্ম এই—পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত পিপীলিকাদিগকে এরূপে রাখা চাই— একখানী চতুষ্কোণ কাচের উপর আর একখানি রাখ। দুইয়ের মধ্যে কিছু ফাঁক রাখিবে, যেন পিপীলিকাগুলি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। তার পর, বাগিচার মাটি দ্বারা এই ফাঁক পূর্ণ করিয়া জীবন্তদিগকে তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দাও। তাহারা তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দমত সেতু, ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে। আমার পালিত পিপীলিকা গুলি সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, তাহার প্রমাণ এই যে ইহারা অনেক কাল যাবৎ জীবিত আছে। ইহাদের আচার ব্যবহার আমি প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বে, সকলে মনে করিতেন, যে শ্রামিক, অর্থাৎ পুরুষ পিপীলিকাগণ কেবল কয়েক সপ্তাহ বাঁচে এবং স্ত্রী গুলি অল্পকয়েক মাসের অধিককাল বাঁচে না। কিন্তু আমার কাছে সাত বৎসর বয়স্ক পুরুষ পিপীলিকা এবং বার বৎসর বয়স্কা স্ত্রী পিপীলিকা আছে। পিপীলিকাদের মধ্যে বেশ মায়ামমতাও আছে। যখন শিশু গুলি ডিম্ব হইতে বাহির হইতে থাকে, তখন তাহাদের কষ্ট দেখিয়া বৃদ্ধেরা তাহাদিগকে সাহায্য করে। কিন্তু কখন কখন এরূপ ঘটে— যে, তাহাদের এই যত্ন সত্বেও, এক একটী শিশু অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থাতে বাহির হয়। আমার স্মরণ হয়, এরূপ অবস্থাপন্ন একটী পিপীলিকাকে তাহার সঙ্গীরা প্রায় পাঁচমাস অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিল বলিতে দুঃখ হয়, তাহাকে বাঁচাইতে পারে নাই।"

পিপীলিকাদের মধ্যে বুদ্ধিশক্তি আছে কি না এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সার জন লাবক বলিয়াছিলেন—"যখন একটী বৃহৎ পিপীলিকা সমাজকে অত্যন্ত সদ্ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়—যখন দেখি তাহারা তাহাদের শিশুদিগকে খাওয়াইতেছে; পথ প্রস্তুত, সেতু খনন, গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে, এবং কেহ কেহ দাস পর্য্যন্ত রাখিতেছে—যখন এই সকল প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন আমরা তাহাদিগকে বুদ্ধি বিশিষ্ট জীব না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। আমি নিজে এই মীমাংসাতে উপনীত

১ ইহাঁর নাম সার জন লাবক (Sir John Lubbock) নীচ জন্তু ও জীবসকলের রীতি নীতি বিষয়ে তিনি নানাবিধ সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৫০ বৎসর।

হইয়াছি, যে তাহাদের এবং আমাদের মনের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা প্রকারগত নয় কিন্তু কেবল পরিমাণ গত—অর্থাৎ তাহাদের মন আমাদের মনের মতনই, তবে শেষোক্তটী অনেক অধিক উন্নত।"

মগলফিয়ে।

(বেলুন আবিষ্কর্ত্তা।)

আমরা কখন কি উড়িতে পারিব? যদি কোনও কালে উড়িবার উপায় উদ্ভাবিত হয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে মগলফিয়ে তাহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বেলুনে করিয়া আকাশে ওঠা, উড়িবার প্রথম সোপান বলিতে হইবে। এই বেলুনের আবিষ্কর্ত্তা, ফরাসিস্ পণ্ডিত মগল্‌ফিয়ে।

জোজেফ মগলফিয়ের পিতার একটি কাগজের কারখানা ছিল। মগলফিয়ে তাঁহার দুই ভ্রাতার সহিত ইস্কুলে পড়িতেন। কিন্তু তিনি পাঠে ভাল মনোযোগ দিতে পারিতেন না। মেডিটেরেনীয়ান সমুদ্রতীরে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া তিনি ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাটী হইতে পলায়ন করেন। বাড়ির লোকেরা আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল এবং পুনর্ব্বার শিক্ষকদিগের হস্তে তাঁহাকে সমর্পন করিল। পড়াশুনা যাহাতে তাঁহার ভাল লাগে শিক্ষকেরা অনেক চেষ্টা করিল। তাহার পর তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করায় পড়া শুনার প্রতি আরও তাঁর বিরাগ উপস্থিত হইল। কিন্তু একটা পাঠীগণিত পুস্তক তাঁহার হাতে দেওয়ায় তিনি আহ্লাদে একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পুস্তকের রীতিমত প্রণালী ছাড়িয়া তিনি আপনি কতকগুলি নূতন নিয়ম ও প্রণালী বাহির করিয়া তদনুসারে অঙ্ক কসিতে লাগিলেন এবং তাহার দ্বারা এমন কি উচ্চ অঙ্গের অঙ্ক শাস্ত্রের কঠিন প্রশ্ন সকলও মীমাংসা করিয়াছিলেন। চিরজীবন তিনি এইরূপ বুদ্ধির খেলা খেলিতে ভাল বাসিতেন। বুদ্ধি খাটাইয়া নানা প্রকার নূতন পরীক্ষা করিতে তিনি বড়ই আমোদ পাইতেন।

স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার লালসায় তিনি পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সেন্ট এটিয়েন নামক স্থানে বাস স্থাপন করিলেন এবং সেখানে যাছ ধরিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়া সামান্য অবস্থায় জীবন যাপন করিতেন। পরে, তিনি প্যারিস্ নগরের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিবার উদ্দেশে প্যারিস নগরে গমন করেন।

তাঁর পিতা আবার তাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার কাগজ তৈয়ারির কার-

খানার ভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিলেন। কিন্তু মগলফিয়ে পুরাতন প্রণালীতে সন্তুষ্ট না হইয়া কাগজ তৈয়ারির উৎকৃষ্ট প্রণালী বাহির করিবার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পিতা আপত্তি করায় তাঁহার একটি সহোদরের সহিত ভাগে দুইটি নূতন কারখানা স্থাপন করিলেন। এক্ষণে তিনি অবাধে তাঁহার ইচ্ছামত নানা প্রকার পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাইলেন এবং এইরূপে সচরাচর কাগজ প্রস্তুত করিবার একটি সরল উপায় বাহির করিলেন এবং রঙ্গিণ কাগজ প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু এই সকল পরীক্ষা দ্বারা তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার বিবিধ বিষয়ে তাঁহার উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেলুনের উদ্ভাবনায় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি য়ুরোপে বিস্তার হয়।

কি রূপে বেলুনের কল্পনা তাঁহার মনে প্রথম উদয় হয় সেই বিষয়ে নানা প্রকার গল্প প্রচলিত আছে। একজন বলেন, একটা পরিধেয় বস্ত্র আগুনের সম্মুখে উত্তপ্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে তাহা হইতেই বেলুনের কল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়; কেহ বলেন, তিনি একদিন দেখিতেছিলেন, কি করিয়া উত্তপ্ত বায়ু ধূম-নল দিয়া উপরে উঠিয়া যায়— এইরূপ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এই মহা কল্পনাটি তাঁহার মনে প্রতিভাত হয়। কেহ কেহ বলেন তাঁহার ছোট ভাইয়ের মনে প্রথমে এই কল্পনাটি উদয় হয়। যাই হোক্ তাঁহারা তিন ভায়ে মিলিয়া জুলিয়া এই বিষয়ে পরীক্ষা করিতেন। নানা প্রকার দাহ্য বস্তুর পরীক্ষা করিয়া শেষে তপ্ত বায়ু অধিক উপযোগী বিবেচনা করিয়া একটা কাগজের গোলক তপ্ত বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিয়া প্রকাশ্য পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন। ১৭৮৩ জুন মাসে ইহার প্রদর্শন হয়। এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করিবার জন্য তাঁহার ছোট ভাইকে প্যারিসে পাঠাইলেন। ভেরসাইয়ের প্রাসাদ প্রাঙ্গনে সেই বৎসরেই ঐ ছাঁচের বেলুন প্রদর্শিত হইল। বেলুনের সঙ্গে একটা ঝুড়ি জুড়িয়া দিয়া তাহাতে কতকগুলি জন্তুকে রাখা হইয়াছিল। যখন বেলুন আকাশে উঠিল তখন তাহাদের কোন কষ্ট দেখা গেল না—তাহাতেই এইরূপ মনে হইল মানুষও নিরাপদে উহাতে যাইতে পারে।

পিলাতর্ দো রোজিয়ে ও মার্কিস দার্লাণ্ড এই দুই ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথমে সাহস করিয়া বেলুনে উঠিয়াছিলেন এবং ১৭ মিনিটে ২৪০০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন।

তাহার পরের বৎসরে জোজেফ্ নিজে একটি বৃহৎ বেলুনে করিয়া আকাশে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। যাহারা তাঁহারা সঙ্গে যাইবে মনস্থ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এত উৎসাহ হইয়াছিল যে তাহাদের আপন আপন হক্ সাব্যস্ত করিবার জন্য মারামারি করিতেও প্রস্তুত হইল। কতকগুলি ভাগ্যবান ব্যক্তি সাহসে ভর করিয়া বেলুনে উঠিল এবং তাহাতে করিয়া নিরাপদে আকাশ পথে বিচরণ করিয়া আসিল।

বায়ু অপেক্ষা যে কোন বস্তু লঘু বলিয়া রসায়ন শাস্ত্রে চলিত সমস্তই পরীক্ষা করিয়া

শেষে বেলুনকর্ত্তারা দেখিলেন যে খড় ও পশম পোড়ান'ই বেলুন ফুলাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও সুলভ উপায়। বেলুনের ছিদ্রের নিচে একটা অগ্নি আধার স্থাপিত হইত তাহার সাহায্যে তপ্ত বায়ু বেলুনের মধ্যে প্রবেশ করান হইত। কিন্তু ইহাতে দুইটি অসুবিধা হইত। (১) ইহাতে করিয়া অগ্নি শিখা বেলুনের পার্শ্ব পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে। (২) ঠিক কি পরিমাণে তাপ বেলুন উঠাইবার নামাইবার জন্য আবশ্যক তাহা স্থির করা যায় না।

M. Charles হাইড্রোজন গ্যাস প্রথম ব্যবহার করিলেন। জোজেফ মগলফিয়ে শেষে তাহাই গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে তাঁহার ভাবনা পড়িল কি করিয়া বেলুনের আবরণ দুষ্প্রবেশ্য করা যায়। তিনি মনে করিলেন ইণ্ডিয়া রবর তার্পিণ তৈলে গলাইয়া তাহার বার্ণিস রেশমি কাপড়ে লাগাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বেলুনের আবরণ প্রস্তুত হইতে পারিবে। এই মৎলব অনুসারে একটা বেলুন প্রস্তুত করিয়া টুয়িলরি হইতে ছাড়িয়া দিলেন সেই বেলুন রাজধানী হইতে ৪০ মাইল উর্দ্ধে আকাশ পথে উঠিয়াছিল।

প্যারিসের বিজ্ঞান সভা বেলুনরচয়িতা ভ্রাতৃদ্বয়কে পত্রব্যবহারি সভ্য পদে নিযুক্ত করিলেন—গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরীক্ষা চালাইবার জন্য ৪০০০০ ফ্রাঙ্ক তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। অনুজ এতিয়েন রাজসভায় সম্মানিত হইলেন—জোজেফ এক সহস্র ফ্রাঙ্ক করিয়া পেনসিয়ান ভোগ করিতে লাগিলেন। ফ্লুরির যুদ্ধক্ষেত্রে এই মগল্‌ফিয়ের বেলুন ফরাসিস্ সৈন্যের অনেক উপকার করিয়াছিল কিন্তু ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কিছুকাল পরে যখন নেপোলিয়ন প্রথম কন্‌সল পদে অভিষিক্ত হইয়া ব্যবসায়ীদিগকে সম্মান ভূষণ প্রদান করিতেছিলেন তখন দেখা যায় মগল্‌ফিয়েও সেই সম্মান-ভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও পরে তিনি "ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালক" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি "ব্যবসায় উৎসাহ প্রদায়িনী" নামক একটা সভা স্থাপন করেন। এবং বেলুন বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সন্ধ্যা।

গিয়েছে ডুবিয়া রবি,
জগত সেজেছে কবি,
মধুর সুকণ্ঠ লোয়ে গাহিছে অমৃত গান ;

সাঁঝের অবশ কায়,
তাপিত দক্ষিণা বায়
শুনি সেই মহাগান শীতল করিছে প্রাণ।
ধীরি ধীরি তারাগুলি
আসিতেছে আঁখি মেলি
জগতের মহাগানে মিলাইতে নিজ তান।
চন্দ্রমার হাসি মুখ,
সেথা আর নাহি দুখ,
আনন্দে উঠেছে মাতি আর মুখ নাহি ম্লান।
গগনের নীল কোলে
ভেসে ভেসে যায় চ'লে
শাদা শাদা মেঘগুলি "চাঁদা আয় আয়" বোলে।
চুমিয়া চাঁদের মুখ
পাশরিয়া সব দুখ
চুমটী ফিরিয়ে নিয়ে হেসে হেসে যায় চ'লে।
আকাশ সিন্দুর কায়া
ধরণীতে রাঙা ছায়া
রাঙা সূত্রে ধরা যেন মিলেছে নীলিমা সনে।
প্রণয়ের সুখে ভোর,
ছেয়ে আসে ঘুম ঘোর,
রাঙা মেঘ নেমে আসে ধরণীর কালো বনে।
প্রেম-সুধা পিপাসায়
গৃহ পানে সবে যায়
ভাই ভাই খেলা করে ভাই ভাই হাসে খেলে।
মাতিয়াছে আলিঙ্গনে
গানে গানে প্রাণে প্রাণে
রাগিণী গলিয়া গিয়া মিলায় রাগের কোলে।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছায়াপথ।

মেঘশূন্য নির্ম্মল অন্ধকার নিশীথে তারকাখচিত অনন্ত নীল নভোমণ্ডলে চাহিয়া দেখিলে, আকাশের কটীবন্ধ স্বরূপ ব্রহ্ম কটাহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ব্যাপী একটি বৃহৎ জ্যোতিশালী বিস্তৃত আলোক রেখা আমরা দেখিতে পাই। ইহার নামই ছায়াপথ। যদি পৃথিবী স্বচ্ছ হইত তাহা হইলে এই কটীবন্ধের অপর অর্দ্ধাংশ পদ-নিম্নের ব্রহ্ম কটাহেও আমরা দেখিতে পাইতাম।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের নিকট এই আলোক রেখা অতি আশ্চর্য্যজনক রহস্যের বিষয় ছিল, অনুমান ছাড়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোনই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। প্রতি রাত্রে একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র খচিত পথ মধ্য হইতে এই কিরণ রেখা তাঁহাদের চক্ষে প্রতিভাত হইত, তাঁহারা বিস্ময়াভিভূত চিত্তে ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইতেন। তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই দূরবীন যন্ত্র ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের কৌতূহলের পরিতৃপ্তি হইত না, অনুমানের সত্যতা প্রমাণ হইত না। ইহা বহু দূরের অসংখ্য তারকা সমষ্টির কিরণ রাশি কেবল এই অনুমান মাত্র করিয়াই তাঁহাদের সন্তুষ্ট হইতে হইত। এই আলোক রেখা চিন্তাশীল লোকের যেমন চিন্তা উদ্দীপন করিত তেমনি বিস্ময়াভিভূত অজ্ঞান লোকদিগের কল্পনার বিষয় হইয়াছিল।

এই আলোক রেখা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ভারতবাসীগণ কত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রবাদ এই যে ছায়াপথ দিয়া শচী দেবী ইন্দ্রের সহিত প্রতি রাত্রে দেখা করিতে যান, কেহ কেহ বা বলেন, ইহা স্বর্গারোহণের পথ। অনির্দ্দিষ্ট বিস্ময়জনক এমন একটি দৃশ্যকে কল্পনা প্রভাবে অনেকে যে অনেক প্রকারে দেখিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা এ পর্য্যন্ত কল্পনার স্বপ্ন মাত্র, বিজ্ঞানের প্রহেলিকা মাত্র ছিল, বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে এখন তাহার যথার্থ গূঢ় মহিমা আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। গেলিলিওর নিকটেই আমরা এ জন্য বিশেষ ঋণী। তিনিই প্রথমে দূরবীন অনুসন্ধানে আবিষ্কার করেন যে, বহু দূরস্থিত অগণ্য অসংখ্য তারকারাশির ক্ষীণালোকেই ছায়াপথ দীপ্ত। ছায়াপথের তারকা দেখিবার জন্য অতি বৃহৎ দূরবীন যন্ত্রেরই আবশ্যক এমন নহে, গেলিলিও তাঁহার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ দূরবীন দ্বারাই ছায়াপথের বিস্ময় দেখিয়াছিলেন। ছায়াপথের এক অংশ মাত্র লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে নানা অবস্থাপন্ন তারকা রাশি নিহিত দেখা যায়।

যে নৈহারিক অভিব্যক্তি লইয়া বিজ্ঞান জগতে এত হুলস্থুল, সেই মত অনুসারে একটি ফুলের যেমন শিশু অবস্থা, অপরিস্ফুট অবস্থা, এবং পূর্ণ বিকাশের অবস্থা আছে

একটি জ্যোতিষ্কেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। সেই মত অনুসারে, আমাদের সৌর জগত একটি মাত্র তারকা কলিকা ছিল ক্রমে যতই তাহা পরিণত হইতে লাগিল ততই সেই একটি কলিকা হইতে গ্রহ উপগ্রহ রূপ পাপড়ি গুলি চারিদিকে প্রকাশ পাইয়া উঠিল।

সৌর জগতের আদিম অবস্থায় বিশাল জলন্ত গোলকের বাষ্পরাশি আকাশে ব্যাপ্ত ছিল, সেই বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রাতিগ শক্তি প্রভাবে কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া এক একটি বাষ্পচক্র সেই মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে সেই আদিম অতি বিস্তৃত নীহারিকা রাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটি বৃহত্তর গোলকে পরিণত হইল, সেই মধ্যের বৃহত্তর গোলকই আমাদের সূর্য্য—এবং সেই পরিত্যক্ত চক্রগুলির ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ মিশিয়া এখন আবার তাহারা একটি একটি গ্রহ রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে তাহারাই সৌর জগতের উপগ্রহ।

আমাদের একটি সৌর জগতের ন্যায় অসংখ্য অগণ্য সৌর জগতে ছায়াপথটি সৃজিত। সৌর জগত বহু দলবিশিষ্ট একটি ফুল——ছায়াপথটি অগণ্য ফুল নির্ম্মিত একটি ফুলমালা। আকাশে যেমন আমরা অতি দীপ্তিবান তারকা হইতে অতি হীনপ্রভ তারকা দেখিতে পাই সেইরূপ নানা শ্রেণীর প্রভাযুক্ত তারকা রাশি নানারূপ শৃঙ্খলায় ছায়াপথে বিন্যস্ত। আকাশের অসংলগ্ন তারকার ন্যায় কোন কোন স্থানে অসংলগ্ন ভাবে একটি একটি তারকা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে কোন কোন স্থানে যেন কোন অপ্রতিহত শক্তি বলে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার মধ্যে হীরক চূর্ণের ন্যায়, চূর্ণ তারকাকণা অপরূপ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আবার কোথায় একসারে কতকগুলি নিবদ্ধ, কোথায় পুষ্পমালিকার ন্যায় গোলাকারে গ্রথিত, কোথায় বা বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি শৃঙ্খলায় সজ্জিত। এই তারকামণ্ডলীতে বর্ণের বিচিত্রতা অতি সুন্দর। রক্ত পীত হরিৎ চম্পক নীল ইত্যাদি নানা বর্ণের বিচিত্রতায় পরস্পরের শোভা আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকাংশ তারকাই রক্ত পীত ও কমলালেবুর বর্ণ বিশিষ্ট। সেই রক্ত পীত বর্ণশালী দলবদ্ধ তারকা রাশির মধ্যে মধ্যে দু একটি নীল হরিৎ বেগুণ প্রভৃতি ভিন্ন বর্ণের তারা সংযোগে সকল বর্ণেরই সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

সর উইলিয়ম হার্শেল তাঁহার দূরবীন যন্ত্র দ্বারা আকাশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন বাষ্পময় নীহারিকা রাশি পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী নীহারিকা রাশি হইতেই অভিব্যক্ত। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে নীহারিকা রাশির গাঢ় অংশ লঘু অংশের সহিত মিলিয়া একটি একটি জ্যোতিষ্ক গোলক রূপে পরিণত। যে ছায়াপথ অসংখ্য তারকার রাজ্য—তাহাতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন তারকার অভাব নাই।

যে হীনপ্রভ বিশালবিস্তৃত বাষ্পরাশি এখনো জ্যোতিষ্কে পরিণত হয় নাই, আবার যে সকল অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, ও ক্ষুদ্রতর বাষ্পরাশি মধ্যভাগে জমাট বাঁধিয়া জ্যোতিষ্ক হইবার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এবং যাহারা জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং অবশেষে যাহারা জ্যোতিষ্ক রূপে পরিণত হইয়াছে, এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন সকল শ্রেণীর জ্যোতিষ্কই ছায়াপথে বিদ্যমান। ছায়াপথের ক্ষুদ্র এক অংশে তারকা কলিকা হইতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট তারকা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে নানা ভাবের উদয় হয়।

এই অনন্ত প্রসারিত জ্যোতিষ্ক মালিকা নির্ম্মিত ছায়াপথ যাহার এক একটি ক্ষুদ্র তারকা এক একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য—এবং অধিকাংশই আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর এবং দীপ্তিশালী, ইহার বিষয় ভাবিলে হৃদয় বিস্ময়াভিভূত হয়।

পৃথিবীই আমাদের পক্ষে অতি প্রকাণ্ড অতি মহান। যদি আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মনুষ্য বংশ পরম্পরা পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল তথ্য এবং পৃথিবীর সৌন্দর্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলেও ইহার সমস্ত গূঢ় তাৎপর্য্য ধারণায় সক্ষম হইত কি না সন্দেহ।

কিন্তু এই মহান পৃথিবী সূর্য্যের তুলনায় কি অতি সামান্য একটি বিন্দু স্বরূপ—পৃথিবী হইতে সূর্য্য ১৫ লক্ষ গুণ বড়। নক্ষত্র খচিত যে অল্প মাত্র আকাশ খণ্ড আমাদের নিকট অনন্ত বলিয়া বোধ হয় সেই আকাশের এক ক্ষুদ্র খণ্ডে মাত্র ছায়াপথ স্থিত—সেই ক্ষুদ্র খণ্ডেই আমাদের সূর্য্যের ন্যায় লক্ষ লক্ষ সূর্য্য লক্ষ লক্ষ গ্রহ উপগ্রহদিগের অধীশ্বর রূপে রাজ্য করিতেছে, পৃথিবীর মত কত লক্ষ লক্ষ গ্রহ তাহাদের অধীনে চালিত হইতেছে, আমাদের সৌর জগতের ন্যায় কত লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ পরস্পরকে পরস্পর আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের সূর্য্যের অভ্যন্তরে কি রূপ কার্য্য চলিতেছে তাহা আমরা কতক পরিমাণে জানি। আমরা কল্পনা করিতে পারি না পারি কিন্তু ইহা জানি, যে ১০ সহস্র ক্রোশ ব্যাপী বাষ্পময় জলন্ত পদার্থের অসাধারণ গতিশক্তি দ্বারা সূর্য্য গোলক মধ্যে প্রতিক্ষণে কি ভয়ঙ্কর ঝটিকা চলিতেছে। সূর্য্যমধ্যস্থ পদার্থ প্রতি মুহূর্ত্তে আশি নব্বই সহস্র ক্রোশ ঊর্দ্ধে ছুটিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তের এই ভয়ঙ্কর বিপর্য্যস্ত পদার্থ রাশিতে সূর্য্য মধ্যে যে কি ভয়ঙ্কর বিপ্লব চলিতেছে তাহা আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না। সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত, যে এই ভয়ঙ্কর ভাব আমাদের নিকট লুক্কায়িত। প্রতি দিন প্রাতঃকালে যখন অতি নিস্তব্ধ শান্ত ভাবে সূর্য্য আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় তখন শান্তি রসে নিমগ্ন হইয়া আমরা সূর্য্যকে প্রণাম করি। কিন্তু এক সঙ্গে উত্থিত শত শত ভীষণ ঝটিকার সমস্ত পৃথিবী কম্পন জনিত গর্জ্জনে, শত শত ঘোর বজ্র নিনাদেও সূর্য্যের সে বিপ্লব বুঝাইতে অক্ষম। এই সকল জানিয়া আমরা ছায়াপথের একটি একটি তারকায় যখন এইরূপ এক একটি সূর্য্য দেখিতে পাই, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।

কেবল ছায়াপথ কেন, আমরা আকাশের যে দিকে চাহিয়া দেখি, সৌর জগতের কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া চারিদিকে যে অসংখ্য নক্ষত্র রাশি দেখিতে পাই সকলই এক একটি সূর্য্য। ইহারা আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত যে ইহাদের গ্রহ উপগ্রহ আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের চক্ষে যে অল্প মাত্র আকাশ প্রত্যক্ষ তাহাতেই যখন আমরা এত অসংখ্য সূর্য্য দেখিতে পাই, তখন এইরূপ একটির উপর একটি করিয়া কত শত শত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আকাশের কোলে জাগিতেছে যাহা আমরা অতি বৃহৎ দূরবীন যন্ত্র দ্বারাও দেখিতে অপারক।

প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি প্রায় ১০০ লক্ষ ক্রোশ—কিন্তু আমাদের নিকট হইতে ঐ সকল তারকাবলী এত দূরে স্থিত যে ঐ রূপ প্রভূত দ্রুত গতিতে আবহমান কাল দৌড়িয়াও উহাদের আলোক এখনো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছে নাই। ছায়া-পথের দুর্ভেদ্য গভীর তারকা মণ্ডপ ভেদ করিতে গিয়া হার্সেল কেবল মাত্র ২০০ লক্ষ তারকা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। ৯২০ লক্ষ মাইল দূর পর্য্যন্ত দূরবীন যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় ইহার উপর আর দূরবীন দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় না। তাহার পর আবার সেই অস্পষ্ট আলোক রেখায় পরিণত হয়। তদপেক্ষা দূরে আর স্পষ্ট তারকা রাশির চিহ্ন পাওয়া যায় না কেবল মাত্র ধূমময় একটি আলোক দৃষ্টি পথে পতিত হয়। কেবল মাত্র চক্ষে আমরা ছায়াপথে যেমন একটি বাষ্পময় আলোক রেখা দেখিতে পাই, দূরবীণ যন্ত্র দ্বারাও অবশেষে আমরা সেই একই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাই। যেরূপ বিস্ময়চিত্তে ছায়া পথের তথ্য জানিতে জ্যোতির্ব্বেত্তারা তারকাসমুদ্র পার হইতে অগ্রসর হন, তেমনি বিস্ময় চিত্তে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া আবার অজ্ঞান অন্ধকারে পথহারা হইয়া পড়িতে হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নূতন নিয়ম" এই নামে বাইবেলের উত্তর খণ্ডের একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বম্‌ওয়েচ্ সাহেব ইহার অনুবাদক। বম্‌ওয়েচ সাহেব আমাদের দেশে কোন অংশে অপরিচিত নহেন। কাহারো ইহা অবিদিত নাই যে, কিয়ৎ বর্ষ পূর্ব্বে নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থে যাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; ইহাঁর প্রাণপণ যত্নে নীলকরের দৌরাত্ম্য বঙ্গদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে এজন্য বঙ্গ দেশ ইহাঁর নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। বঙ্গদেশ ইহাঁর পুরাতন ভালবাসার বস্তু, তাই বঙ্গ ভাষার প্রতি ইহাঁর এমনি যত্ন যে, বঙ্গ সাহিত্যের অন্ধি-সন্ধি সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া ঘুঁটিয়া বঙ্গ ভাষাকে ইনি একরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান অনুবাদ-খানি দেখিলে যথার্থই বাঙ্গালা পুস্তক বলিয়া মনে হয়,—খ্রীষ্টানী পুস্তকের বঙ্গ ভাষা বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এ পুস্তকে তাহার পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকের ভাষা অপেক্ষা বর্ত্তমান গ্রন্থের ভাষা যে কত বিশুদ্ধ, নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

কলিকাতা বাইবেল সোসাইটির প্রকাশিত মথি লিখিত সুসমাচার নামক একখানি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গ্রন্থ সম্প্রতি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ভাষার সহিত পাঠক বর্ত্তমান্ গ্রন্থের ভাষার একবার তুলনা করিয়া দেখুন।

বাইবেল সোসাইটির গ্রন্থে এইরূপ লিখিত—

"তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেন না; তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে।"

বর্ত্তমান গ্রন্থে এইরূপ লিখিত—

"তুমি তোমার ভার্য্যা মারিয়াকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কারণ তাঁহার গর্ভে যাহা সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে।" বাইবেল সোসাইটির গ্রন্থে "কেন না" শব্দ এমন স্থানে বসিয়াছে যেখানে কোন বাঙ্গালি কেননা-শব্দ ব্যবহার করে না; "তুমি ভাত খাইও না, কেননা ভাতে একটা মাছি রহিয়াছে," এরূপ কথা কেহই আমরা বলি না, — ঐরূপ দ্বিতীয় পুরুষের উক্তিতে "কারণ" শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত, বমুউয়িচ সাহেব তাহাই করিয়াছেন।

বাইবেল সোসাইটির গ্রন্থে আছে—

"যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলিবে "রে নির্ব্বোধ" সে মহাসভায় দায়ে পড়িবে।"

বর্ত্তমান গ্রন্থে ঐস্থানে আছে "আর যেজন আপন ভ্রাতাকে বলিবে "তুই নির্ব্বোধ" তাহাকে সীনোদ্রিয়মে দায়ী হইতে হইবে।"

উপরে "রে নির্ব্বোধ" কথা ঠিক্ হয় নাই, কেননা "রে নির্ব্বোধ" বলিলেই তাহার পরে আরো কিছু কথা বলিবার আছে এইরূপ বুঝায়, "তুই নির্ব্বোধ" বলিলে ঐ কথা-টিতেই শ্রোতার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়—উহার পরে আর কোন কথা বলিবার আছে এরূপ বুঝায় না, আবার, "মহাসভায় দায়ে পড়িবে" ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না, "সীনোদ্রিয়মে দায়ী হইতে হইবে" বলাতে ইহুদীদিগের বিশেষ একটা জাতীয় সভার কথা বলা হইতেছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বাইবেল সোসাইটির গ্রন্থে আছে "যে তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে," "দক্ষিণ গালে" এ কথার পরিবর্ত্তে যদি "ডা'ন গালে" এই কথা লেখা হইত, তাহা হইলে যদিও ভাষা রূঢ় হইত তথাপি বেমানান্ হইত না; কিন্তু "দক্ষিণ গালে" না সাধুভাষা না ইতর ভাষা—দুয়ের খিচুড়ি। বমুউইচ সাহেব শ্রদ্ধাভাজন বক্তার মুখে যেরূপ কথা শোভা পায় সেইরূপ ভদ্রোচিত কথা ব্যবহার করিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন—

"যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিবে।"

এইরূপ সাধুভাষাই শ্রদ্ধাভাজন বক্তার মুখে ভাল শুনায়।

বাইবেল সোসাইটির গ্রন্থে আছে—

"কিন্তু তুমি যখন উপবাস করিবে মস্তকে তৈল মাখিও ও মুখ ধুইও।"

বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

"কিন্তু তুমি যখন উপবাস করিবে তখন তুমি মস্তক তৈলাভিষিক্ত করিবে এবং মুখ প্রক্ষালন করিবে।"

বাইবেল সোসাইটির অনুবাদক বক্তার গাম্ভীর্য্য বিলক্ষণ নষ্ট করিয়াছেন।

"তুমি যখন উপবাস করিবে" এরূপ গম্ভীর ভাবে বচন আরম্ভ করিবার পরে মস্তকে তৈল মাখিও ও মুখ ধুইও" এরূপ চুট্‌কি ধরণের কথা নিতান্তই লয়-বিরুদ্ধ শুনায়। তাহা অপেক্ষা আগাগোড়া এক ভাবে কথা বলা ভাল, এইরূপ বলা ভাল যে—"উপোষ কর্-বার সময় যেন তেল্ মেখো আর মুখ ধুয়ো।" গৃহের কোন স্ত্রীলোক বালকের প্রতি এইরূপ উপদেশ করিলে তাহা শুনায় ভাল, কিন্তু একজন শ্রদ্ধেয় বক্তা যখন সাধারণ লোকমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করেন, তখন ওরূপ ধরণের কথা নিতান্তই অস্বাভা-বিক শুনায়। বর্ত্তমান গ্রন্থ অনেক বিষয়ে অন্যান্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গ্রন্থ অপেক্ষা বাঙ্গালিদিগের সুপাঠ্য—ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তবে মূলগ্রন্থ গ্রীক ভাষায় বিরচিত তাহার সমস্ত ভাব আদ্যোপান্ত অব্যাহত রাখিতে অনুবাদককে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলেই তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে; এই কারণে

বর্ত্তমান গ্রন্থের ভাষা সাধারণতঃ যথেষ্ট বিশদ ও প্রাঞ্জল হইলেও বিশেষ বিশেষ স্থলে ভাষার উপরে বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা অনুবাদকের গুণ কি দোষ তাহা ঠিক বলা দুষ্কর। কেননা অনুবাদকের পক্ষে ভাষার প্রাঞ্জলতা রক্ষা করা যেমন আবশ্যক—মূলের সহিত ঐক্য রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক, বরং ভাষার এদিক ওদিক্ করা চলে—মূলের সহিত অনৈক্য রক্ষা কিছুতেই চলে না। বর্ত্তমান গ্রন্থ দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গ ভাষার উপরে গ্রন্থকারের অনেক দূর ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে; এজন্য কোন কোন স্থানে তিনি কষ্টকল্পনা করিয়া স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমাদের এরূপ মনে হয় না যে, বঙ্গ-ভাষা এখনো তাঁহার আয়ত্তে আসে নাই, আমাদের মনে হয় যে মূল গ্রন্থের ভাব যথাসাধ্য অব্যাহত রাখিতে গিয়া অনুবাদক স্থানে স্থানে অগত্যা ঐরূপ কষ্ট কল্পনায় বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে অন্যান্য খ্রীষ্টানি গ্রন্থ অপেক্ষা বর্ত্তমান গ্রন্থ বাঙ্গালির পাঠোপযোগী হইয়াছে। বাপ্‌টিষ্ট মিসন যন্ত্র হইতে যে সকল খ্রীষ্টানি বাঙ্গালা পুস্তক বাহির হয়, তাহার অদ্ভুত শব্দ-বিন্যাস দেখিয়া বাঙ্গালি পাঠক হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ সে দোষে বঞ্চিত। খ্রীষ্টান বঙ্গ-সাহিত্যে এই ব্যাপারটি নিতান্তই নূতন।

হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর।

পৌষ মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "উচিত।" কেহ কেহ "হাত" লিখিয়াছেন। বোধ করি "হাত"ও হইতে পারে। যাঁহারা উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়।
" মহেন্দ্রনাথ রায়।
" বিশ্বেশ্বর সাধু।
" নীলাম্বর দাস।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।
" মনোমোহন নিয়োগী।
" ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
" কালিকাচরণ রায়।
" নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
" বিহারীলাল গোস্বামী।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
" ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায়।
" জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল।
" শশিভূষণ দত্ত।

---

১ ম ভাগ। } বালক। চৈত্র ১২৯২। { ১২ শ সংখ্যা।

ডেঞ্চে পিঁপ্‌ড়ের মন্তব্য।

দেখ দেখ, পিঁপ্‌ড়ে দেখ! ক্ষুদে ক্ষুদে রাঙা রাঙা সরু সরু সব আনাগোনা করিতেছে—ওরা সব পিঁপড়ে, যা'কে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্চি ডেঞ্চে, সমুচ্চ ডাঁইবংশসম্ভূত, ওই পিঁপড়েগুলোকে দেখ্‌লে আমার অত্যন্ত হাসি আসে!

হা হা হা, রকম দেখ, চল্‌চে দেখ, যেন ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে! আমি যখন দাঁড়াই তখন আমার মাথা আকাশে ঠেকে; সূর্য্য যদি মিছ্‌রির টুক্‌রো হত আমার মনে হয় আমি দাঁড়া বাড়িয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এনে আমার বাসায় জমিয়ে রাখ্‌তে পারতুম। উঃ, আমি এত বড় একটা খড় এতখানি রাস্তা টেনে এনেছি, আর ওরা দেখ কি কর্‌চে—এক্‌টা মরা ফড়িং নিয়ে তিন জনে মিলে টানাটানি করচে। আমাদের মধ্যে এত ভয়ানক তফাৎ! সত্যি বল্‌চি আমার দেখ্‌তে ভারি মজা লাগে!

আমার পা দেখ আর ওদের পা দেখ—যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ের আর অন্ত দেখিনে—এত বড় পা। পদ-মর্য্যাদা এর চেয়ে আর কি আশা করা যেতে পারে! কিন্তু পিঁপ্‌ড়েরা আপনাদের ক্ষুদে ক্ষুদে পা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে। দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়! হাজার হোক, পিঁপ্‌ড়ে কি না!

ওরা একে ক্ষুদ্র, তাতে আবার আমি বিস্তর উঁচু থেকে দেখি—ওদের সবটা আমার নজরে আসে না! কিন্তু আমি আমার অতি দীর্ঘ ছ' পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে কটাক্ষে দৃক্‌পাত করে আন্দাজে ওদের আগাগোড়াই বুঝে নিয়েছি। কারণ পিঁপ্‌ড়ে এত ক্ষুদ্র যে ওদের দেখে ফেল্‌তে অধিকক্ষণ লাগে না। পিঁপ্‌ড়ে জাতি সম্বন্ধে আমি ডাঁই ভাষায় একটা কেতাব লিখ্‌বে এবং বক্তৃতাও দেব।

পিঁপ্‌ড়ে সমাজ সম্বন্ধে আমার বিস্তর অনুমানলব্ধ অভিজ্ঞতা আছে। ডেঞ্চেদের সন্তানস্নেহ আছে অতএব পিঁপ্‌ড়েদের তা কখনই থাক্‌তে পারে না, কারণ তারা পিঁপ্‌ড়ে, কেবল মাত্র পিঁপ্‌ড়ে, পিঁপ্‌ড়ে ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোনা যায়, পিঁপ্‌ড়েরা মাটিতে বাসা বানাতে পারে—স্পষ্টই বোধ হচ্চে তারা ডেঞ্চে জাতির কাছ থেকে স্থপতি বিদ্যা শিক্ষা করেছে—কারণ তারা পিঁপ্‌ড়ে—সামান্য পিঁপ্‌ড়ে, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে পিপীলিকা!

পিঁপ্‌ড়েদের দেখে আমার অত্যন্ত মায়া হয়—ওদের উপকার করবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত বলবতী হয়ে ওঠে। এমন কি, আমার ইচ্ছে করে, সভ্য ডেঞ্চেসমাজ কিছু দিনের জন্য ছেড়ে, দলকে-দল ডেঞ্চে ভ্রাতৃবৃন্দকে নিয়ে পিঁপ্‌ড়েদের বাসার মধ্যে

বাসস্থাপন করি এবং পিঁপ্‌ড়ে-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হই—এতদূর পর্য্যন্ত ত্যাগস্বীকার কর্ত্তে আমি প্রস্তুত আছি। তাদের শর্করকণা গলাধঃকরণ করে এবং তাদের বিবরের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে কোন ক্রমে আমরা জীবনযাপন করতে রাজি আছি, যদি এতেও তারা কিছু মাত্র উন্নত হয়!

তারা উন্নতি চায় না—তারা নিজের শর্করা নিজে খেতে এবং নিজের বিবরে নিজে বাস করতে চায়—তার কারণ, তারা পিঁপ্‌ড়ে, নিতান্তই পিঁপ্‌ড়ে! কিন্তু আমরা যখন ডেঞ্জে, তখন আমরা তাদের উন্নতি দেবই, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে আমরা বাস করব! আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগনে ভাইঝি ও শ্যালকবৃন্দ।

যদি জিজ্ঞাসা কর তাদের শর্করা আমরা কেন খাব এবং তাদের বিবরে কেন বাস করব তবে তার প্রধান কারণ এই দেখাতে পারি যে তারা পিঁপ্‌ড়ে এবং আমরা ডেঞ্জে। দ্বিতীয়, আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে পিঁপ্‌ড়েদের উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছি, অতএব আমরা তাদের শর্করা খাব এবং বিবরেও বাস করব। তৃতীয় আমাদের প্রিয় ডেঁই ভূমি ত্যাগ করে আস্‌তে হবে, সেই জন্য সেই দুঃখ-নিবারণের জন্য শর্করা কিছু অধিক পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক। চতুর্থ, বিদেশে বিজাতির মধ্যে বিচরণ করতে হবে, নানা রোগ হতে পারে—তাহলে বোধ করি, আমরা বেশী দিন বাঁচ্‌বনা—হায় আমাদের কি শোচনীয় অবস্থা! অতএব শর্করা খেতেই হবে, এবং বিবরেও যতটা স্থান আছে সমস্ত আমরা এবং আমাদের শ্যালকেরা মিলে ভাগাভাগি করে নেব!

পিঁপ্‌ড়েরা যদি আপত্তি করে—তবে তাদের বল্‌ব অকৃতজ্ঞ। যদি তারা শর্করা খেতে এবং বিবরে স্থান পেতে চায় তবে ডেঁই ভাষায় তাদের স্পষ্ট বল্‌ব তোমরা পিঁপ্‌ড়ে, ক্ষুদ্র, তোমরা পিপীলিকা। এর চেয়ে আর প্রবল যুক্তি কি আছে!

তবে পিঁপ্‌ড়েরা খাবে কি? তা জানিনে। হয়ত আহার এবং বাসস্থানের অকুলান হতেও পারে, কিন্তু এটা তাদের ধৈর্য্য ধরে বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের বীর্যপদস্পর্শে ক্রমে তাদের পদবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে। শৃঙ্খলা এবং শান্তির কিছুমাত্র অভাব থাক্‌বে না। তারা ক্রমিক উন্নতি লাভ করুক্‌ এবং আমরা ক্রমিক শর্করা খাই, এম্‌নি এক্‌টা বন্দোবস্ত থাক্‌লে তবেই শৃঙ্খলা এবং শান্তিরক্ষা হবে, না হলে তুমুল বিবাদের আটক কি? মাথায় গুরুভার পড়লে এতই বিবেচনা করে চল্‌তে হয়!

শর্করাভাবে এবং অতিরিক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার ভারে যদি পিঁপ্‌ড়েজাতি মারা পড়ে? তা হলে আমরা অন্যত্র উন্নতি প্রচার করতে যাব—কারণ আমরা ডেঞ্জে জাতি; উচ্চ পদের প্রভাবে অত্যন্ত উ[illegible]।

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব।

বানর বলিতেছেন—আমরা বানর, অতি শ্রেষ্ঠ পুরাতন বহ্নবংশ জাত, অতএব আমরাই সকল জীবের প্রধান। নল নীল অঙ্গদ এবং সুবিখ্যাত মর্কটেরা এই বহ্নবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নমস্কার!

আমরা যে শ্রেষ্ঠ, তার প্রমাণ এই যে, আমাদের ভাষায় বানর অর্থই শ্রেষ্ঠ—আর আর সকল জীবই অশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদের আমরা ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকি। যেহেতু তাহারা অপক্ক কদলী দগ্ধ করিয়া খায়, এরূপ আচরণ আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। তাহা ছাড়া তাহারা সাতজন্মে গায়ের উকুন বাছিয়া খায় না এম্‌নি অশুচি! আত্মীয় বান্ধবের সহিত দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গায়ের উকুন বাছিয়া দেয় না তাহাদের সমাজে এম্‌নি সহৃদয়তার অভাব। শ্রেষ্ঠজাতি বানর জাতি এই সকল কারণে মনুষ্য জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকে।

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় কত দিব! আমরা পুরুষানুক্রমে কখন চাষ করিয়া খাইনা। সনাতন বানর শাস্ত্রে চাষ করার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন বহ্নর সময়ে যে নিয়ম ছিল আমরা আজও সেই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি—এম্‌নি আমরা শ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে ভ্রষ্টাচারী কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ম্লেচ্ছ মনুষ্য জাতি চাষ করিয়া খায়, তাহারা চাষা!

চাষ না করাই যে সাধু আচার তাহার প্রমাণ এই, এতকাল ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বানর-সমাজে চাষ না করাই প্রচলিত। চাষ করাই যদি সদাচার হইত, তবে বহ্ন-আচার্য্য কি চাষ করিতে বলিতেন না? আমাদের বানর বংশে যে মহাত্মা জাম্বুবানের মত এত বড় দূরদর্শী পণ্ডিত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, কই তিনিত চাষের কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে যদি আধুনিক অর্ব্বাচীন নব্য বানরের মধ্যে কোন মহাপুরুষ ল্যাজ খসাইয়া মানুষীয়ানা করিতে চান, তবে তিনি সনাতন পবিত্র বানর প্রথা ত্যাগ করিয়া চাষ করিতে থাকুন্!

কিন্তু অত্যন্ত আমোদের বিষয় এই যে, বানরদের শ্রেষ্ঠতায় মুগ্ধ হইয়া মানুষেরা সম্প্রতি প্রমাণ করিতে আসিয়াছে যে, মানুষরা বানর বংশজাত। এইরূপ মিথ্যা-যুক্তির সাহায্যে গোলেমালে কোন প্রকারে মানুষ বানরের দলে মিশিতে চায়! হে বানর-ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা সাবধান, মানুষ যে বানর এরূপ গুরুতর ভ্রম মনে স্থান দিও না!

গোটাকতক বিষয়ে বানরে ও মানবে সাদৃশ্য দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হইতেছে! এই প্রমাণ হইতেছে যে, মানবেরা বানর হইবার দুরাকাঙ্খায় ক্রমাগত আমাদের অনুকরণ করিতেছে—ক্রমাগত আমাদিগকে ape করিতেছে। ম্লেচ্ছ:

মানব কাঁচকলা খাইত বটে, কিন্তু পক্ক কদলীর গৌরব আমাদের কাছ হইতে শিখিয়াছে। উকুন বাছা সম্বন্ধেও মানবীরা আমাদের অতি অসম্পূর্ণ অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে, শ্রেষ্ঠবানরেরা তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না! আনন্দ উপলক্ষে অনেক সময়ে মানবেরা দন্তপংক্তি বিকাশ করে বটে, এবং মনে করে বুঝি অবিকল বানরের মত হইলাম—কিন্তু সে মুখভঙ্গি আমাদের পবিত্র বানরজাতি-প্রচলিত সনাতন দন্ত বিকাশের কাছ দিয়াও যায় না!

মানবের ভাষায় দুই একটা এমন শব্দ প্রয়োগ দেখা যায় বটে, যাহাতে সহসা কোন নির্ব্বোধের ভ্রম হইতেও পারে যে বানরের সহিত মানবের যোগ আছে! "লেজে তেল দেওয়া," "লেজ মোটা হওয়া" শব্দ মানবেরা এমন ভাবে ব্যবহার করে যেন তাহাদের সত্য সত্যই লেজ আছে। কিন্তু উহা ভাণ মাত্র—উহাতে কেবল তাহাদের হৃদয়ের বাসনা প্রকাশ পায় মাত্র—হায়রে দুরভিলায! আমি শুনিয়াছি দুরাশাগ্রস্ত লোককে মানুষ বলিয়া থাকে "অমুক-কাজ করিয়া এম্‌নি কি চতুর্ভুজ হইয়াছ!" ইহাতে চতুর্ভুজ হইবার জন্য মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা প্রকাশ পায়! শ্রেষ্ঠ বনুবংশজাত বানরেরা সহজেই চতুর্ভুজ হইয়াছে, কিন্তু ম্লেচ্ছ মানবেরা শত জন্ম তপস্যা করিলেও তাহা হইতে পারিবে না।

যাহা হউক, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মানবেরা বানর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, বস্ত্রদ্বারা তাহারা সযত্নে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পাছে তাহাদের রোমাবলীর বিরলতা ও লাঙ্গুলের অভাব ধরা পড়ে—পবিত্র বানর তনুর সহিত ম্লেচ্ছ মানব তনুর প্রভেদ দৃশ্যমান হয়। লজ্জার বিষয় বটে! কিন্তু বনুবংশীয়দের কি আনন্দ! আমরা কি গৌরবের সহিত আমাদের লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে পারি!

আমাদের কিচিকিচি-পুরাণ মানুষের পিতৃপুরুষের সাধ্য নাই যে বুঝে—কারণ শ্রেষ্ঠ জাতির শাস্ত্র নিকৃষ্ট জাতি কখনই বুঝিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি মানুষের ভাষায় কি কোন প্রকৃত তত্ত্ব কথা আছে—যদি থাকিত তবে কি আমাদের পবিত্র কিচিকিচির সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য পাইতাম না!

অতএব আমাদের বনুদেব ও হনুমদাচার্য্য চিরজীবী হইয়া থাকুন, আমরা যেন চিরদিন বানর থাকি, এবং কিচিকিচি শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর বানরত্ব লাভ করি। আমাদের সনাতন ল্যাজ যেন সযত্নে রক্ষা করিতে পারি, এবং আস্ফালনের প্রভাবে তাহা দিনে দিনে যেন দীর্ঘতর হইতে থাকে! আর যে যা খায় খাক্ আমরা যেন কেবল কলা খাইতেই থাকি, এবং শ্রেষ্ঠ বানর ব্যতীত অন্য জীবকে দেখিবামাত্র দাঁত খিঁচাইয়া আনন্দ লাভ করি!

কল্পনা, অনুকরণ ও অভ্যাস জনিত রোগ।

কতকগুলি রোগ ছোঁয়াচে অর্থাৎ স্পর্শজন্য একথা সকলেই অবগত আছেন। অনেকে বসন্তের রোগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। ভৌতিক সংযোগে দেহ হইতে দেহান্তরে রোগের বীজ পরিচালিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু রোগের বিষয় দূর হইতে চিন্তা করিয়া বা রোগীর অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে গিয়া তৎরোগাক্রান্ত হওয়া বিস্ময়জনক কথা সন্দেহ নাই।

মহামারীর সময়ে চিকিৎসকেরা যতদূর সম্ভব প্রসন্ন মনে থাকিতে পরামর্শ দেন যিনি যত অধিক ভীত হন তাঁহার বিপদের আশঙ্কা তত অধিক। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে। রোগের ছবিটি সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া না রাখিয়া মনকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করিলে এই চিন্তাজনিত পীড়ার আশঙ্কা থাকে না। যথার্থ পীড়া এবং এইরূপ পীড়ার মধ্যে সম্বন্ধ নিকট, তাহা আমরা ক্রমশঃ বিবৃত করিব।

একটী তিন বৎসরের বালিকা প্রত্যহ ভৃত্যের কোলে উঠিয়া বেড়াইতে যাইত, ভৃত্যের এক চক্ষু টেরা ছিল, কিছু দিন পরে দেখা গেল বালিকা ভৃত্যের বক্রদৃষ্টির অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে, আমোদ দেখিবার জন্য কেহ অনুরোধ করিলেই বালিকা বক্র দৃষ্টি করিয়া দেখাইত। ক্রমে কেহ দেখিতে না চাহিলেও বালিকার অক্ষিগোলক অনেক সময়ে স্থানভ্রষ্ট হইতে দেখা যাইত। ক্রমে এই রোগ বদ্ধমূল হইল।

আর একটী বালিকা কম্পবায়ু রোগগ্রস্ত কোন আত্মীয়াকে দেখিতে গিয়াছিল। রোগীকে নানা রূপ হস্ত সঞ্চালন এবং মুখভঙ্গী করিতে দেখিয়া বালিকা তাহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। বালিকা সর্ব্বদাই রোগীর কাছে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিত। বাড়ী ফিরিয়া যাইয়াও কয়েক দিন যাবৎ রোগীর অঙ্গভঙ্গী অভিনয় করিল। মধ্যে মধ্যে বালিকা রোগীকে দেখিতে আসিত এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিন কয়েক হাত পা ছুড়িত। কিছু দিন পরে এই আত্মীয়ার মৃত্যু হওয়াতে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হইল, কিন্তু বালিকার রোগ পাকা হইয়া দাঁড়াইল। অতিপরিশ্রম বা অন্য কোন কারণে মানসিক অবসাদ জন্মিলেই রোগের সমুদয় লক্ষণ স্ফুট হইত, সামান্য সূত্র ধরিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ ক্রমে এত শক্ত হইয়া দাঁড়াইল যে সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইল।

যথার্থ পীড়ার ন্যায় অনুচিকীর্ষাজনিত পীড়াও অনেক সময়ে ব্যক্তিবিশেষে অবরুদ্ধ না থাকিয়া বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গল্প করিয়াছেন একদা একজন স্ত্রীলোক তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসে—তাহার কম্প রোগ ছিল। একটী বালক দেখিয়াই তাহার অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে লাগিল। এই বাল-

ককে দেখিয়া আর এক জনেরও রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইল। রোগ ক্রমে সমুদয় পরিবারে ছড়াইয়া পড়িত সন্দেহ নাই, কিন্তু রোগীদিগকে পৃথক ঘরে আটকাইয়া রাখা হইল বলিয়া ততদুর হইতে পারিল না। রোগাক্রান্ত কয়েক সপ্তাহ কয়েদ থাকিয়া প্রতীকার লাভ করিল।

সকলেই যে সাধ করিয়া অনুকরণ করিতে যান তাহা নহে, অনেক সময়ে কি যেন এক দুর্দ্দম শক্তির বলে স্বতঃই অনুকরণের কার্য্য হইতে থাকে।

একটী স্ত্রীলোক কোন ক্ষয়কাসগ্রস্ত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন, সর্ব্বদাই কাছে থাকিতে হইত। কিছু দিন পরেই তিনি রোগীর মত শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে এবং কাসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রোগের অপর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর ঠিক কাসের রোগীর ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল, কালক্রমে বাড়িতে লাগিল এবং এই কৃত্রিম রোগ অচিরাৎ এরূপ আকার ধারণ করিল যে বন্ধুবর্গ যুবতীর জীবিতাশা একরূপ বিসর্জন দিলেন। যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কিন্তু ফুসফুসে রোগের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। বহু চিকিৎসায়ও কোন ফল দর্শিল না অবশেষে দুই বৎসর পরে রোগ আপনাআপনি ভাল হইয়া গেল।

প্রত্যক্ষ না করিয়া অন্যের মুখে বর্ণনা মাত্র শুনিয়াও অনেক সময়ে এই শ্রেণীর রোগ জন্মিতে দেখা যায়। কোন যুবতীর এক বন্ধুর পক্ষাঘাত রোগ হয়, যুবতী রোগীকে দেখিতে যান নাই। কিন্তু কাহারও মুখে সবিস্তার বর্ণনা শুনিয়া নিজের শরীরে রোগের অনুপ্রবেশ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে তাঁহার পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, অবশেষে মাজা পর্য্যন্ত পড়িয়া গেল, উঠিয়া বেড়ান দূরে থাক, ক্রমে শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনও অসাধ্য হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিলেন, কেহই কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে এক দিন পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে আর্ত্তনাদ শুনিয়া রোগী নিজের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া শশব্যস্তে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ঐ ঘরে একজন আত্মীয় মুমূর্ষু অবস্থায় শায়িত ছিলেন। মনের আবেগে শারীরিক বাধা যেন কোথায় চলিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে রোগী আরোগ্য লাভ করিলেন।

এ দেশী কোন পর্ব্বোপলক্ষে বাজী হইতেছিল, একজন বাজীকর পা টানিয়া আনিয়া বক্ষোলগ্ন করিয়া দেখাইল। একটী ইংরেজ বালিকা বাজী দেখিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিল। পর দিন প্রাতে আর শয্যা ত্যাগ করিতে পারে না। দেখা গেল তাহার এক পা বাঁকিয়া আসিয়া শরীরে দৃঢ় লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মিনতি বলপ্রয়োগ সমুদয় ব্যর্থ হইল। আরক শোঁখাইয়া অচেতন করিলে পা সহজেই টানিয়া সোজা করা যাইত, কিন্তু সংজ্ঞা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পা আবার বাঁকিয়া দাঁড়াইত, অনেক দিন এই অবস্থায় গেল। অবশেষে এই মহিলা ইংলণ্ডে নীত হইলেন। একদিন একাগ্রচিত্তে সতরঞ্চ খেলা

দেখিতেছিলেন, সতরঞ্চ খেলায় মনের কত ঐকান্তিকতা জন্মে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অজ্ঞাতসারে একজন বন্ধু আস্তে আস্তে পা টানিয়া সোজা করিয়া দিলেন। জানিতে পারিয়াই মহিলা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বেশ সহজ মানুষের মত হাঁটিয়া গেলেন একটু কষ্ট পাইলেন না।

অভ্যাস যখন এমন গুরুতর হইয়া উঠে যে ইচ্ছা করিয়াও তাহাকে অতিক্রম করা যায় না, তখন তাহাকে রোগ বলা যাইতে পারে। আদৌ ইচ্ছা হইতে প্রসূত হইয়া ক্রমে তাহা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই রোগের প্রভাবে আমরা স্বেচ্ছাধীন মানব হইয়াও জড় যন্ত্রের ন্যায় হইয়া উঠি। সামান্য সামান্য বিষয়ে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ একটী শব্দ বিশেষের এত ভক্ত হইয়া পড়েন যে তাঁহারা যাহা কিছু লেখেন তাহার কোন না কোন স্থানে প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক এই শব্দটী না বসাইয়া থাকিতে পারেন না, চিঠির মধ্যে লিখিতে বিস্মৃত হইলে পুনশ্চসাৎ করেন, কিন্তু না লিখিয়া স্বস্তি নাই। আমার এক জন আত্মীয় চিঠী লিখিয়া চারি কোণ কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিতেন। অতি সামান্য কাগজেই প্রায় চিঠী লিখিতেন, দেখিয়া মনে করিলাম কাগজের পার্শ্বের বন্ধুরতা দূর করাই বুঝি ছাঁটার উদ্দেশ্য। বোধ হয় প্রথমে এই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু শেষে অতি মসৃণ বিলাতী চিঠীর কাগজ দিয়া দেখিয়াছি লেখা সারা হইলেই, কাঁচি তলব করিয়াছেন।

বিখ্যাত কোষকার জন্‌সন্ সাহেব রাস্তার পার্শ্বস্থ প্রত্যেক আলোক স্তম্ভ স্পর্শ না করিয়া অগ্রসর হইতেন না। টামস্ উইলিয়ম একটী সুন্দর গল্প করিয়াছেন, তাঁহার এক প্রতিবেশী ঘড়ি বাজিলেই প্রতিবার সঙ্গে সঙ্গে এক দুই তিন করিয়া গণিত। ক্রমে শব্দ না শুনিয়াও সে ঠিক বাজার সময়ে মুখে ঘড়ির অনুকরণ করিত। এক মিনিট এ দিক ও দিক হইত না।

শ্রীভুবনমোহন মিত্র।

খবরাখবর।

পার্লেমেণ্টের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন শেষ হইলে পর, কন্সার্ভেটিভ্ সভ্য সংখ্যা লিবারেল্ সভ্য সংখ্যা হইতে অনেক কম হইলেও, ক্ষমতা ও বড় বড় পদের লালসা ছাড়িতে না পারিয়া কন্সার্ভেটিভ্ গভর্ণমেণ্ট আপনার হাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসনভার

রাখিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু বেচারীরা দুদিনও সে ক্ষমতা ও বড় বড় পদগুলি ভোগ করিতে পাইল না। মহারাণী এ নূতন পার্লেমেণ্ট খুলিবার সময় যে বক্তৃতা করেন, জেসি কলিন্সস্ নামে এক জন পার্লেমেণ্টের সভ্য বলেন যে ইংলণ্ডের কৃষকদের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে তাহাতে কিছুই বলা হয় নাই, আর তাঁহার মতে সে বিষয়ে আইন করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা হইবে, মহারাণীর বক্তৃতায় এরূপ একটা অঙ্গীকার নিবিষ্ট করা উচিত। কন্সার্ভেটিভ্ গভর্ণমেণ্ট খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। সভ্যগণের ভোট্ নেওয়া হইল—কলিন্সসের দিগে ভোট অনেক হইল, গভর্ণমেণ্টের দিগে কম হইল। গভর্ণমেণ্টকে লজ্জায় গভর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিতে হইল। এখন আবার লিবারেলরা কর্ত্তা; গ্লাড্‌ষ্টোন্ প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। আমরা লিবারেলের জয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কারণ আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, তাহাদের জয় হইলে লর্ড রীপণ আমাদের ষ্টেট্-সেক্রেটরী হইবেন। কিন্তু সে আশায় গ্লাড্‌ষ্টোন্ আমাদের নিরাশ করিয়াছেন। লর্ড কিম্বার্লি, যিনি, লর্ড রীপণ যখন আমাদের গভর্ণর জেনেরেল ছিলেন তখন তাঁহাকে আমাদের জন্য কভিনেণ্টেড্ সিভিল সার্ভিসের দ্বার উন্মুক্ত করিতে দেন নাই, অদৃষ্টক্রমে আমাদের ভারতীয় রাজনৈতিক ভাঙ্গা নৌকার কাণ্ডারী হইয়াছেন। লর্ড কিম্বার্লি হইতে কোন আশা নাই—লর্ড কিম্বার্লির সিভিল সার্ভিস্ ডেস্‌পাচে যে সত্যে-চোখ-বোজা, অসত্যে চোখ-মেলা আর উকীলী তর্ক আছে, তাহার লেখক হইতে কোন উদার কার্য্য বা নীতি আশা করা যাইতে পারে না। গ্লাড্‌ষ্টোন কেন লর্ড রীপণকে ভারত সচীব করিলেন না কে বলিতে পারে? আমার বিবেচনায় গ্লাড্‌ষ্টোন্ দেখিলেন যে আয়র্লণ্ডকে আইরিস্ পার্লেমেণ্টে দিবার চেষ্টাতেই তাঁহাকে সহস্র সহস্র শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে—আয়র্লণ্ডে অরেঞ্জমেন্‌রা কোলাহল করিবে, ইংলণ্ডে শুধু কন্সার্ভেটিভ্‌ই নয় সহস্র সহস্র লিবারেল্‌ও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। গ্লাড্‌ষ্টোন্ ভাবিলেন এ যুদ্ধের কি পরিণাম তাহারই স্থিরতা নাই—তাহাতে আবার লর্ড রীপণকে ভারতসচীব করিয়া এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ান্‌দিগকে একটা লাফালাফি ও চেঁচামেচি করিবার সুযোগ এমন সময়ে দিলে একটা বিপদের স্থানে দুটা বিপদ খাড়া হইবে। তাই লর্ড রীপণকে গ্লাড্‌ষ্টোন্ জলযুদ্ধ বিভাগের সেক্রেটরী করিয়াছেন, আর ভারতস্কন্ধে যে ন্যায় ও সত্য বিরোধী কিম্বার্লিকে চাপাইয়াছেন। এবারে লিবারেল গভর্ণমেণ্ট হইতে ভারতবর্ষের যে বিশেষ কোন উপকার হইবে আমরা এমন আশা করি না। লিবারেল গভর্ণমেণ্ট আইরিশ প্রশ্নের মীমাংসা লইয়াই ব্যস্ত—ভারতবর্ষের তো ৮৬ জন সভ্য কার্য্যে বাধা দিতে পার্লেমেণ্টে বসিয়া নাই—ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্টের সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি?

বালগেরিয়া ও সার্ভিয়াতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। পূর্ব্ব রোমালিয়া বাল্‌গেরিয়ার সহিত মিলিত হইবে। এ সম্বন্ধে তুরস্ক ও বালগেরিয়াতে পত্রাপত্র চলিতেছে।

ব্রহ্মদেশের লোকগুলি অতি মূর্খ। ইংরেজ রাজত্বে থাকা কি সুখ তাহা তাহারা জানে না বলিয়াই এখনো তাহারা দলে দলে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠাইতেছে। ইংরেজ বলিতেছেন ব্রহ্মদেশীয়েরা ডাকাত—ডাকাতি করিতেছে। যে অপরের দেশ কাড়িয়া লয় সে ডাকাত নয়, যে আপন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশে অস্ত্র ধারণ করে সে ডাকাত! ইতিমধ্যে ডাকাতদিগকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া মনোমত কথা বাহির করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে চেষ্টা হইয়াছিল। ইংলণ্ড এ কথা শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। প্রাণের ভয় দেখাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণ নিবারিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট ব্রহ্মযুদ্ধের সমস্ত ভার ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। লিবারেল গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন, কন্সার্ভেটিভ্ অপজিশন অনুমোদন করেন। ভারতবর্ষের অর্থে যুদ্ধ করিতে আর রাজ্য বিস্তার করিতে উভয়েরই উৎসাহ তুল্য ও প্রশংসনীয়। ব্রহ্ম যুদ্ধের ব্লুবুক বাহির হইয়াছে। পরস্ব অপহরণের, দুর্ব্বল পীড়নের নীতি তাহাতে অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। সে ব্যাখ্যান বালকদের না পড়াই ভাল।

আয়করের খবর তো বালকেরা সকলেই পাইয়াছেন। চাষ বাস বা জমিদারীর আয়ের উপর কর বসিবে না। আর প্রায় সমস্ত রকমের আয়ের উপরই এই কর বসিবে। সৈনিক বিভাগের কমিশনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ যাঁহারা মাসে মাসে ৫০০ টাকার অধিক বেতন পান না তাঁহাদিগকে ট্যাক্স দিতে হইবে না। এ বৈষম্য কেন? মাসে ৫০০ টাকাতেও ট্যাক্স নাই, আর বৎসরে ৫০০ টাকাতে ট্যাক্স আছে? ভারতবর্ষ কত গরীব আর ইংলণ্ড কত ধনী আয় করের ইতিহাস দেখিলে বুঝা যায়। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের লোক সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক সংখ্যা প্রায় চারি কোটি। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৮০৫০ জন লোক ছিল যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০ হাজারের কম নহে ও ৪০ লক্ষের বেশী নহে। আর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৫০ হাজারের উপর আয় তেরটি ব্যক্তির বই নাই। এক হাজার হইতে দশ হাজার পর্য্যন্ত আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে সাত চল্লিশ হাজার দুশ আটাশী, আর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুশ সাতাত্তর। গবর্ণমেণ্ট আন্দাজ করেন যে ভারতবর্ষে এক লক্ষ ব্যক্তি আছে যাহাদিগের বার্ষিক আয় এক হাজার টাকার কম নয়। আর ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা সোয়া চার লক্ষ। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ২০ ক্রোড় লোকের মধ্যে এক লক্ষ মাত্র লোকের বার্ষিক আয় অন্যূন এক হাজার টাকা আর ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে সাড়ে তিন ক্রোড় লোকের মধ্যে এমন ব্যক্তির সংখ্যা সোয়া চার লক্ষ। ইংলণ্ডে ১৫০০ টাকার উপরে যাহাদের আয় কেবল তাহাদেরই আয়-কর দিতে হয়। আমাদের ৫০০তেও দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট আন্দাজ করেন প্রতি টাকায় ৫ পাই হিসাবে কর বসাইয়া এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ভারতবর্ষে উঠিবে। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে সাড়ে তিন ক্রোড় লোক মাত্র—ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার ষষ্ঠাংশ—আর সে দেশে প্রতি টাকার এক পাইয়ের ৫ ভাগের

৪ ভাগ হিসাবে কর বসাইলে ছুই ক্রোড় টাকার বেশী উঠে! ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় আয়কর দ্বারা ইংলণ্ড এক বৎসরে ১৬ ক্রোড় টাকা উঠাইয়াছিলেন, আর আমাদের দেশে দরিদ্র হইতে দরিদ্রদিগকে পীড়ন করিয়াও গভর্ণমেণ্ট ১৮৬০ হইতে ১৮৭১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩½ ক্রোড়ের অধিক টাকা উঠাইতে পারেন নাই।

কিন্তু আয়কর দিয়াই এবার আমরা রক্ষা পাইতেছি না। বঙ্গেশ্বর সার রিভার্স্ টম্‌সন্ আর একটি নূতন কর বসাইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে চলিয়াছেন। ছুটি অতি মহান উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য এ করটি বসান হইবে। ইহার নাম পাটোয়ারী কর। ইহার উদ্দেশ্য! ১ম, বঙ্গে কৃষি কর্ম্মের অবস্থা নির্ণয় করা; ২য়, মামলা মোকদ্দমা করান। এই ছুটা মহা উদ্দেশ্য কি করিয়া সংসিদ্ধ হইবে জান? গ্রামে গ্রামে পাটোয়ারী ও কানুনগো নিযুক্ত করিয়া। পাটোয়ারী ও কানুনগোরা যোগী তপস্বী বা হাওয়াখোর নয়, তাহাদিগের উদরান্নের জন্য একটি কর বসাইতে হইবে—সে কর রেয়ত ও জমিদারদিগকে দিতে হইবে। বঙ্গে পাটোয়ারীর মৃত্যু বহুকাল হইয়াছে। বেহারে আজও তিনি জীবিত, বেহারের তিনি রক্তই শোষণ করিতেছেন—অন্য কোন উপকার করেন নাই। বাঙ্গালার কি যথেষ্ট রক্ত-শোষণ হইতেছে না? যদি হইতেছে তবে আবার একটা মৃত রক্তশোষক জীবকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহার বুকের উপরে বসাইবার প্রয়োজন কি? পাটোয়ারীর লিখিত কৃষিকর্ম্মের বিবরণ কতটা মূল্যবান হইবে সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আর পাটোয়ারীর পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তিতে মামলা মোকদ্দমা কি করিয়া কমিবে আমরা বুঝিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট বলেন, রেয়তদের জমিতে স্বত্ব ও অধিকারাদির কোন বিবরণ লিখিত থাকে না বলিয়াই জমিদার ও রেয়তে এত মোকদ্দমা। পাটোয়ারী তাহাদের স্বত্ব ও অধিকারাদির বিবরণ রক্ষা করিবে—জমিদারের সহিত রেয়তের মোকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাইবে। ৬ টাকার পাটোয়ারী রেয়তের স্বত্ব ও অধিকারাদি যথাযথ বিবৃত করিবে! জমিদার কি তাহাকে ঘুস্ দিতে পারিবে না? রেয়তের আরো সর্ব্বনাশ হইবে—জমিদার যাহা ইচ্ছা তাহাই পাটোয়ারী দ্বারা লিখাইবে। ঢাকার কমিশনর এ বিষয়ে বলিয়াছেন "পাটোয়ারী নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করিবে আশা করা নিতান্ত বৃথা। লাভের মধ্যে এই হইবে, প্রজাদিগকে একটা বেশী ট্যাক্স দিতে হইবে।" সার রিভার্স টম্‌সন্ তো বাঙ্গালীকে খুসী করিতে ক্রটী করেন নাই। এখন যাবার সময় কি একটা নূতন ট্যাক্স তাহার ঘাড়ে মিথ্যামিথ্যি না চাপাইলেই নয়?

সার্ রিভার্স্ টম্‌সন্ চৌকিদারী আইনও পরিবর্ত্তন করিতে বসিয়াছেন। গ্রাম্য চৌকিদার আজকালকার সৃষ্টি নয়। ইংরেজের পূর্ব্বে, মুসলমানের পূর্ব্বে তাহার সৃষ্টি। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট আইন করেন গ্রাম্য পঞ্চায়েত গ্রাম্য চৌকিদার নিয়োগ করিবেন, চৌকিদারী কর ধার্য্য ও আদায় করিবেন, চৌকিদারদিগকে বেতন দিবেন ও

অপরাধ করিলে দণ্ড দিবেন বা বরখাস্ত করিবেন। গবর্ণমেন্ট এখন বলিতেছেন, পঞ্চায়েত নিয়ম মতে চৌকিদারদিগকে বেতন দেন না; অপরাধীর অনুসন্ধানে পুলিশকে ইচ্ছার সহিত সাহায্য করেন না; আর চৌকিদার পুলিশের কথা একেবারে গ্রাহ্য করে না। ১৮৭০-এর আইন কিরূপ কার্য্য করিতেছে ইহা নির্ণয় করিবার জন্য সার্ রিভার্স্ টম্সন্ এক কমিশন নিয়োগ করেন—তিন ব্যক্তি কমিশ্যনর নিযুক্ত হন, তিন জনই ইয়োরোপীয় ও সরকারী চাকর। কমিশনরগণ প্রকৃত পক্ষে কোন অনুসন্ধান করেন নাই। কতকগুলি প্রশ্ন তাঁহারা জেলার মাজিষ্ট্রেটদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরের উপরে নির্ভর করিয়া কমিশনরগণ রিপোর্ট্ লিখিয়াছেন। কমিশনরগণ বলেন, চৌকিদারেরা মাসে মাসে বেতন পায় না বটে, কিন্তু তিন তিন মাস পরে তাহারা বেতন পায়। কমিশনরগণের মধ্যে ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেবও এক জন। তিনি বলেন চৌকিদাররা বেতন পায় না বলিয়া প্রায় কখনো ওজর আপত্তি করে নাই। তাহারা বেতন তিন তিন মাস পরে পায়। আর পঞ্চায়েতগণ চৌকিদারী কর বেশ আদায় করিয়াছেন। শতকরা নব্বই টাকা আদায় হইয়াছে—ইহার অধিক কোন্ ট্যাক্স আদায় হয়? তিনি আরও বলেন, জমিদারেরা আপন প্রজা হইতে এত শীঘ্র ও নিয়মে কর আদায় করিতে পারে না যত শীঘ্র ও নিয়মে পঞ্চায়েত সকল চৌকিদারী কর আদায় করিয়াছে। পঞ্চায়েত অপরাধীর অনুসন্ধানে পুলিশকে স্বেচ্ছাক্রমে সাহায্য দেয় না, এ কথার উত্তর এই—পুলিশের সহিত মেলামেশা মানুষের পক্ষে সহজ কাজ নয়—যাহার অসত্যে ভয় নাই, পরস্ব অপহরণে, পরপীড়নে যাহার আপত্তি নাই, শুধু সেই পুলিশকে সাহায্য করিতে পারে। পুলিশকে সকলেই যমদূতের মত ভয় করে—পিশাচের মত ঘৃণা করে। পুলিশ যে দিন মানুষ হইবে, পঞ্চায়েত সে দিন পুলিশের সাহায্য করিবে। আর একটা কথা—গবর্ণমেন্ট ইহাও বলিয়াছেন যে ভদ্রলোক পঞ্চায়েতে বসিতে চাহে না। এ কথা সত্য। কিন্তু সার্ রিভার্স্ টম্সন কি ইহার কারণ জানেন? পঞ্চায়েত গ্রামবাসীরা স্বাধীনভাবে নিয়োগ করিতে পারে না—১৮৭০-এর আইন মতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমোদন ভিন্ন পঞ্চায়েত নিয়োগ হইতে পারে না। পুলিশ যাহাদিগকে সুপারিশ করে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাহাদেরই নিয়োগ পচন্দ হয়। পুলিশ কাহাকে সুপারিশ করে? গ্রামের মধ্যে যাহারা দুর্বৃত্ত দুরাচার, ধর্ম্মভয় শূন্য, পরপীড়নে নিরত। কি করিয়া ভদ্র লোক এমন অবস্থায় পঞ্চায়েতে বসিবে? গবর্ণমেণ্টের উচিত পঞ্চায়েত নিয়োগ স্বাধীন করা—তাহা হইলে গ্রামের যাঁহারা সম্মানিত ব্যক্তি তাঁহারাই পঞ্চায়েতে বসিবেন। চৌকিদারী কর যে নিয়মমতে আদায় হইতেছে ও চৌকিদারও যে বেতন নিয়ম মতে পাইতেছে ইহা তো কমিশনই স্বীকার করিয়াছেন। পুলিশকে কেন পঞ্চায়েত মনের সহিত অপরাধী গ্রেপ্তার কার্য্যে সাহায্য দেন না, আমরা দেখিয়াছি। পঞ্চায়েতের কাছে সাহায্য চাহিলে পুলিশ সংস্কার আবশ্যক।

পঞ্চায়েতের হাতে যে টুকু ক্ষমতা আছে তাহা উঠাইয়া লইলে পঞ্চায়েত একেবারেই পুলিশকে সাহায্য দিবে না। গবর্ণমেণ্টের শেষ কথা চৌকিদার বড় স্বাধীন। চৌকিদার পুলিশের দাস নহে, এই দুঃখ। চৌকিদার ভারতবর্ষে চিরকাল গ্রাম্য পুলিশ, গ্রাম্য লোকদিগের পুলিশ—গ্রাম্য লোকদিগের ভৃত্য। সে যদি সরকারী পুলিশের দাস হইবে, তবে গ্রাম্য পুলিশ রাখিবার দরকার কি? ১৮৭০-এর আইন জারি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? গবর্ণমেণ্ট চাহেন চৌকিদার সরকারী পুলিশের দাস হয়। তবে স্বায়ত্বশাসন খুব হইল। গ্রামবাসী কর দিবে—সে করে সরকার এক এক জন পুলিশ গ্রামে গ্রামে রাখিবেন তাহারা পুলিশের গোয়েন্দা স্বরূপে গ্রামে গ্রামে রহিবে—যে গ্রামবাসী তাহাকে খুসী না রাখিবে সে যাইয়া পুলিশে তাহারই নামে রিপোর্ট করিবে। এই চৌকিদারী আইন জারি করিয়া সার্ রিভার্স্ টম্সন গ্রামে গ্রামে যে একটু স্বায়ত্বশাসন ছিল তাহ বিনষ্ট করিবেন।

বক্তৃতায় আর মিষ্ট কথায় যদি প্রজার দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইত লর্ড ডাফেরীনের শাসনে তাহা হইলে আমাদের দেশে একটি প্রাণীরও কোন রকমের দুঃখ কষ্ট থাকিতে পারিত না। আয়কর বসাইবার সময় লর্ড ডাফেরীন বলেন গবর্ণমেণ্ট কোথা কোথা খরচ কমাইতে পারেন এ বিষয় ভাল করিয়া দেখিবার জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করিবেন। এখন একটা কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। ৬।৭ জন লোক মাত্র সে কমিটির সভ্য—তাহাদের মধ্যে এক জন বই দেশীয় ব্যক্তি নাই—তিনিও সরকারী চাকর। এ প্রহসনের অভিনয়ে কি লাভ হইবে? অপরাধী স্বয়ং আপন অপরাধের বিচার করিতে নিযুক্ত হইল। খরচ কমিতে পারে কোথায়? সিভিলিয়ানরা এদেশে যত মাহিয়ানা পায় এমন কোন দেশে পায় না—সিভিলিয়ান কমিশন কি বলিবে, "আমাদিগের মাহিয়ানা কমাও"? সিভিলিয়ান প্রায় সকলেই ইংরেজ—সিভিলিয়ান কমিশন কি বলিবে, "কম মাহিয়ানায় অধিকাংশ সিভিলিয়ানের পদ দেশীয়দিগকে দিয়া খরচ কমাও"? অনেক সিভিলিয়ানকে গবর্ণমেণ্ট কেবল অন্ন উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দিবার জন্য চাকুরি দিয়াছেন—সিভিলিয়ান কমিশন কি বলিবে, "এ কাজগুলি উঠাইয়া দাও"? মিষ্ট কথায় ভারতবর্ষের খরচ কমিল না। লর্ড ডাফরীণ যদি একটা কমিশন নিয়োগ করিতেন, যাহার সভ্য সংখ্যার অন্যূন অর্দ্ধেক দেশীয় আর স্বাধীন ব্যক্তি হইতেন, লোকে বিশ্বাস করিত তিনি সত্যই সত্যই খরচ কমাইতে চাহিতেছেন। এখন কেহই সে রকম বিশ্বাস করিবে না। ও দিকে ইংলণ্ডে লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্চহিল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ভারতশাসন বিষয়ে এক রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হইবে। এখন গ্লাড্ষ্টোন সাহেব পার্লেমেণ্টীয় কমিটি নিযুক্ত করিলেন। ইহাতেও আমাদের কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। পার্লেমেণ্টের কোণের ঘরে বসিয়া রিপোর্ট পড়িয়া রিপোর্ট লিখিলে কি হইবে? ভারতবর্ষে যদি কতকগুলি স্বাধীন ব্যক্তির

একটা কমিশন আসিত, আসিয়া নগরে নগরে বহুদর্শী ও বিজ্ঞ দেশীয় ও বিদেশীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিত, তবেই ভারতশাসন কি প্রণালীতে হইতেছে তাহা ইংলণ্ড জানিতে পারিতেন। এখানেও মিষ্ট কথায় ভারত শাসন সংশুদ্ধ হইল না।

কলিকাতায় মিয়ুনিসিপাল কমিশনরগণ স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার (Health officer) নিয়োগে আপনাদের কাপুরুষতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দেশীয় অতি উপযুক্ত ও বহুদর্শী কর্ম্মার্থী থাকিতেও তাঁহারা একজন বিদেশীয় যুবককে স্বাস্থ্য রক্ষকের পদ দিয়াছেন। ইংরেজের খাতির কি কর্ত্তব্য জ্ঞান ও স্বদেশানুরাগকে পরাজয় করিল?

এলাহাবাদ হাইকোর্টের চিফ্ জষ্টিস্ কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ্ জষ্টিস্ হইয়া আসিতেছেন। সার্ রিচার্ড গার্থকে সময় না হইতেই পেন্‌শন্ দিয়া বিলাত পাঠান হইল—কৃষ্ণচর্ম্ম রমেশ মিত্রের আর চিফ্ জষ্টিসের পদে কোন দাওয়া রহিল না। সার্ কোমার পেথেরাম অতি দক্ষ ও ন্যায়বান লোক। কলিকাতা সৌভাগ্যবান। এলাহাবাদ দুর্ভাগ্য—তাই সার্ কোমারের মত লোক হারাইল। কলিকাতায় খারাপ লোক থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই—কারণ কলিকাতায় লোক চোখ্-ফুটা। এলাহাবাদেই এরূপ স্বাধীন-চেতা, সৎসাহসী ও ন্যায়বান বিচারকের বিশেষ প্রয়োজন। সার্ কোমার ভিন্ন অন্য কোন্ বিচারক লেড্‌ম্যানের মোকদ্দমায় এমন সত্য কথা শুনাইত! সার্ এলফ্রেড লায়েলের শরীর হইতে একটি কণ্টক বিদূরিত হইল।

লর্ড ডাফেরীণ সে দিন মান্দ্রাজে একটা বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে গত বৎসর ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ভলাণ্টিয়ার শ্রেণীতে প্রবেশাধিকারের জন্য ভারতবর্ষী-য়েরা যে সকল আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি সেক্রেটেরী অভ্ ষ্টেটকে অতি সহানুভূতি প্রকাশক এক ডেস্‌পাচ লিখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বিবে-চনায় ভলাণ্টিয়ার দ্বারাই ভারত সুরক্ষিত হইতে পারে না। কখনো কি কেহ বলি-য়াছে যে কেবল ভলণ্টিয়ার দ্বারাই ভারত সুরক্ষিত হইতে পারে? অনাবশ্যক ঐ কিন্তু'টা যোজনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? লর্ড ডাফেরীণের কথা শুনিয়া আমা-দের বোধ হয় ডেস্‌পাচে যদিও সহানুভূতির ছড়াছড়ি হইয়াছে, প্রকারান্তরে দেশীয়দিগকে ভলাণ্টিয়ার শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয় ইহাই ডেস্‌পাচের মর্ম্ম।

কলিকাতা হাইকোর্টে দু জন নূতন জজ নিযুক্ত হইল—দু জনই বিদেশীয়। সমগ্র ভারতবর্ষে এক জনও উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তি মিলিল না!

শুনিতে পাই লর্ড ডাফেরীণ 'কাপ্তান হিয়ার্সে বনাম লেড্‌মান্' মোকদ্দমার কাগজ পত্র তলব করিয়াছেন। আমাদের একথা বিশ্বাস হয় না। আর তলব করিয়া থাকিলেও যে লেড্‌মান্‌কে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন আমাদের মনে হয় না। আর লেড্‌মানের অপরাধই বা কি? আদালতে দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে, "শুয়র," "হারাম-জাদা," "শালা" প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। তা অনেক ইংরেজই এরূপে

মধুবর্ষণ করিয়া থাকে। মাথাপাগলা কাপ্তান হিয়ারসে ধরাইয়া দিয়াছে বলিয়াই বেচারী লেড্‌মান ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

জন্মতিথির উপহার।

(একটি কাঠের বাক্স)

স্নেহ-উপহার এনেছিরে দিতে
লিখেও এনেছি দু-তিন ছত্তর।
দিতে কত কিযে সাধ যায় তোরে
দেবার মত নেই জিনিষ-পত্তর!
টাকাকড়ি গুলো ট্যাঁকশালে আছে,
ব্যাঙ্কে আছে সব জমা,
ট্যাঁকে আছে খালি গোটা দুত্তিন
এবার কর বাছা ক্ষমা!
হীরে জহরাৎ যত ছিল মোর
পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরী যে যত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটিতে!
দুনিয়া সহর জমিদারী মোর,
পাঁচ ভূতে করে কাড়াকাড়ি,
হাতের কাছেতে যা-কিছু পেলুম,
নিয়ে এনু তাই তাড়াতাড়ি!

স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেতরে,
বাজারে-জিনিষ কিনে নিয়ে এসে
বল্ দেখি দিত কে তোরে!

জিনিষটা অতি যৎসামান্য
রাখিস্ ঘরের কোণে,
বাক্সখানি ভোরে স্নেহ দিনু তোরে
এইটে থাকে যেন মনে!
বড়সড় হবি ফাঁকি দিয়ে যাবি,
কোন্‌খেনে র'বি লুকিয়ে,
কাক্কা ফাকা সব ধুয়ে-মুছে ফেলে
দিবি একেবারে চুকিয়ে,
তখন্ যদিরে এই কাঠ-খানা
মনে একটুক্ তোলে ঢেউ—
একবার যদি মনে পড়ে তোর
"বুজি" ব'লে বুঝি ছিল কেউ!

এই যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড় বিষম দেশটা!
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চ'লে যেতে
ভুলে যেতে সবার চেষ্টা!
ভয়ে ভয়ে তাই সবারে সবাই
কত কি যে এনে দিচ্ছে,
এটা-ওটা দিয়ে স্মরণ জাগিয়ে
বেঁধে রাখিবার ইচ্ছে!
মনে রাখ্‌তে যে মেলাই কাঠ খড় চাই,
ভুলে যাবার ভারি স্থবিধে,
ভালবাস যা'রে কাছে রাখ্ তারে
যাহা পাস্ তারে খুবি দে!
বুঝে কাজ নেই এত শত কথা,
ফিলজফি হোক্ ছাই!
বেঁচে থাক তুমি সুখে থাক বাছা
বালাই নিয়ে ম'রে যাই!

বাঙ্গালার বসন্তোৎসব।

মনোহরপুর নামে ক্ষুদ্র গ্রাম—ক্ষুদ্র শীর্ণা নদী কাজলা তাহার তিন দিক বেড়িয়া আপন মনে চলিয়া গিয়াছে। এই চৈত্র মাসে তাহার অস্থি পঞ্জর সার হইয়াছে;—ক্ষীণ স্রোতটুকু বালুকা রাশির ভিতর দিয়া কোন রূপে প্রবাহ রক্ষা করিতেছে। নদীর ধারে বড় বড় অশ্বথ বটের গাছ, একটু দূরে অাঁব কাঁঠালের বাগান। আম্র মুকুলের সে নবীন অনাঘ্রাত শোভাটুকু আর নাই—কিন্তু মধুমক্ষিকার দল এখনও পরিমল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। সুদূরে—দূরবিস্তৃত রবিশস্যক্ষেত্র সোণার রঙ মাখিয়া বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে। মাঝে মাঝে কণ্টকসর্ব্বস্ব দীর্ঘ শিমুল গাছ লাল ফুল ফুটাইয়া জীবন সার্থক বোধ করিতেছে। তাহার ডালে বসিয়া বউ কথা কও আপনার মর্ম্ম কথা অবাধে গাহিয়া চলিয়াছে। কোথাও অাঁব বাগানের ঝোপ হইতে কোকিলের গান পর-দায় পরদায় উঠিতেছে।

আজ্ বাসন্তী পূর্ণিমা। গ্রামে বড় ধূম—জগন্নাথ আচার্য্যের গৃহে ফুলদোলের বড় ঘটা।

আচার্য্যের ব্যবসা গুরুগিরি। দুই দিন মাত্র হইল তিনি ভৃত্য হরিদাস সঙ্গে প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবার—স্ত্রী, একটী পুত্র, একটী কন্যা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণী। তিনি বাল বিধবা এবং প্রবীণা—জগন্নাথের সংসারে তিনিই কর্ত্রী। ছেলের নাম লোকনাথ, মেয়ের নাম প্রভা—আর বধূর নামটী মনোহর পুরে কেউ জানে না বটে কিন্তু পিত্রালয়ে গিয়া গোপনে আমরা জানিয়া আসিয়াছি—হৈমবতী। নাম শুনিয়া পাঠক পাঠিকার মত আমরাও একেবারে হতাশ্বাস হইয়া গিয়াছি। বলা বাহুল্য, তখনকার কোন নাটক নবেলে ইঁহার প্রবেশ লাভের সম্ভাবনা নাই।

গত রাত্রি হইতে মনোহরপুরে বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। মহা আড়ম্বরে ঢাক ঢোল রসনচৌকীর বাদ্যোদ্যমে এবং আতস বাজীর লীলা খেলার শব্দে ক্ষুদ্র গ্রাম খানি প্রায় কাল সমস্ত রাত্রি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। গ্রামের সমস্ত লোক কাল রাত্রি হইতে নিদ্রার নিকট বিদায় লইয়া আচার্য্য বাড়ীকে কাক-সমাকুলিত বট বৃক্ষের মত করিয়া তুলিয়াছে; যার যে ভাল কাপড় খানি আছে, সে তাই পরিয়া আসিয়াছে—ছেলে বুড়ো সবাই প্রায় সমান আনন্দিত। দুঃখ শোক দারিদ্র্য যে সংসারে আছে, একথাও বুঝি আজ্ কাহারও মনে নাই। কেবল এক পরিবারের গৃহ প্রাচীর ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী রোদনধ্বনি উঠি-তেছিল। আর বছর এমনই দিনে তাহার হৃদয়ের শোণিত, অঞ্চলের নিধি, বার্দ্ধক্যের ভরসা সকলের মত নূতন কাপড় পরিয়া এমনই করিয়া আনন্দ স্রোতে ভাসিয়াছিল—আজ্ দুঃখিনী মাকে ভুলিয়া সে কোথায় রহিয়াছে! মাতা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে কিন্তু

জনস্রোতের আনন্দময় কোলাহলে সে ক্ষীণকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতেছিল। কেহই তাহার দুঃখে দুঃখিত নহে—সকলেই আপনার সুখ লইয়া বিব্রত। কেবল হৈমবতীর হৃদয় সে সৌভাগ্যের মুহূর্ত্তে, আনন্দের উচ্ছ্বাসেও পুত্রশোকাতুরা অনাথিনী বিধবার জন্য কাঁদিতেছিল।

দুই দিন হইল জগন্নাথ বাড়ী আসিয়াছেন। অন্যান্য বার অনেক আগে আসেন, কাজেই উৎসবের উদ্যোগ ধীরে সুস্থে করিবার যথেষ্ট অবসর থাকে। এবার নিতান্ত অসময়ে বাড়ী আসিয়াছেন, কাজ কর্ম্মে হাঁপ ছাড়িবার সময় পাইতেছেন না। বর্ষে বর্ষে গ্রামে আসিয়া প্রত্যেকের বাড়ী যান এবং ছোট বড় সকলকেই আপ্যায়িত করেন। এবার সে সবের কিছুই হইয়া উঠে নাই। অতএব আচার্য্য ঠাকুর প্রয়োজনবশতঃ একবার বাহিরে আসিলে জনস্রোত তাঁহার দিকে ঝুঁকিতেছিল। সে নধর, গৌরকান্ত দেহ, ভক্তিরসে সদাই অমৃতময়—একবার দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবে, সকলেরই এই চেষ্টা। জগন্নাথ সে ব্যস্ততার মধ্যেও হাসিয়া হাসিয়া যথাসম্ভব সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ধবল কৌশিক বস্ত্র ও কৌশিক উত্তরীয়ে সে সুন্দর দেহ অধিকতর সুন্দর দেখাইতেছিল।

মৃণ্ময়ী ঠাকুরাণীও বড় ব্যস্ত, তবে তিনি পাকাগৃহিণী, জগন্নাথের আগমন প্রতীক্ষায় নিজের উপর যাহা নির্ভর করে এমন সব কাজ কিছুই ফেলিয়া রাখেন নাই। ব্যস্ততার মধ্যেও ধীরতার সহিত সব কাজ করিতেছিলেন—ঠাকুর ঘর আর ভাণ্ডার ঘর দণ্ডের মধ্যে সহস্র বার আসিয়া দেখিতে হইতেছিল, তাহাতে ক্লান্তিমাত্র নাই। সে ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার ভয়ে সকলে তটস্থ—সে গম্ভীর মূর্ত্তির সমক্ষে সকলেই সশঙ্কিত হইয়া কাজ করিতেছিল। জগন্নাথ বারম্বার আসিয়া তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাইতেছিলেন। কেবল লোকনাথ আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার গাম্ভীর্য্য টলাইয়া দিতেছিল।—একবার আসিয়া খাবার চায়, আবার আবীর চায়, কখন কুঙ্কুম লইয়া পলায়ন করে। আর নোঙ্‌রা কাপড় লইয়া পিসিমার এত কাছে আসিয়া দাঁড়ায় যে মৃণ্ময়ীও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তিন হাত সরিয়া যাইতে বাধ্য হন। কাজেই লোকনাথ পিসিমার আদরের তিরস্কার মুহুর্মুহ অঙ্গের ভূষণ করিয়া অভীষ্ট সামগ্রী লইয়া মহানন্দে অন্দরবাহিরে ছুটাছুটি করিতেছিল। বাহিরে আসিয়া কাহারও চখে আবীর দেয়, কাহাকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারে, কাহারও কাপড়ে পিচকারী দেয়। পাঠশালার সকল ছেলেই উপস্থিত। তাহারা লোকনাথের অনুগ্রহ নিগ্রহ আজ্ জীবনের প্রধান সুখ দুঃখ জ্ঞান করিতেছিল। যার সঙ্গে লোকুর বড় ভাব, সে যথেষ্ট মিষ্টান্ন, আবীর এবং কুঙ্কুম উপার্জ্জন করিতেছিল, আর যার সঙ্গে সে ভাবের অভাব, সে পেটে কিছু থাক্ আর না থাক্, পিঠে, কাপড়ে এবং চোখে অনেক সহিতেছিল।

হৈমবতী অন্দরের নিভৃতে বসিয়া ধীরে ধীরে ঠাকুরঝির আদেশ মত বধূজনোচিত কাজগুলি নিঃশব্দে সম্পন্ন করিতেছিল এবং সাধ্যমত যার সহায়তা করিতে-

ছিল। কুটুম্ব বাড়ীর একটী যুবতী বধূ আর একটী কিশোরী বালিকাও কাছে বসিয়াছিল। বধূটী আজ্ পিঞ্জরমুক্ত হইয়াছেন, কাজেই বাপের বাড়ীর মত প্রায় মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া হাত মুখ নাড়িয়া নানা গল্প করিতেছিলেন।—হৈম কাজ করিতে করিতে হাসিয়া হাসিয়া তাহা শুনিতেছেন। ছাই ভস্ম গল্প—পরনিন্দা এবং আত্মপ্রশংসা ও অলঙ্কারের কথাই বেশী—সে দিকে তাঁর বড় মন ছিল না। বধূটীকে প্রীত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, অথচ ইহার মধ্যে কাজও করা চাই। কিশোরী বালিকা হাঁ করিয়া হৈমর মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার অনুপম মুখশ্রী দেখিতেছিল, বধূর গল্পও শুনিতেছিল। কাজে এবং আপ্যায়িতে হৈমর অর্দ্ধেক মন, আর অর্দ্ধেকটুকু সেই পুত্রশোকাতুরা অনাথিনী বিধবার জন্য কাঁদিতে ছিল। অতএব থাকিয়া থাকিয়া তিনি প্রভাকে শিখাইয়া দিলেন যে একবার তোর দাদাকে ডেকে আন।

দাদা তখন পিচকারীর রঙে পরিধেয় বস্ত্রখানি চিত্র বিচিত্র করিয়া মাথায় আবীর মাখিয়া রাঙ্গা ভূত সাজিয়া, সমবেশী সঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি প্রভৃতি রাজনীতি কার্য্যে পরিণত করিতেছিলেন। গ্রামের "ছোট লোকের" ছেলেপিলেরা ছোট ঠাকুরের সে মোহন বেশ দেখিয়া একমনে তাহারই কামনা করিতেছিল। পাঠশালার বীর পুরুষদের তখনকার বিক্রম ও গৌরবে তাহারা বিস্মিত হইতেছিল। এমন সময়ে কে আসিয়া লোকনাথকে বলিয়া দিল যে প্রভা তাহাকে ডাকিতেছে। বার বার দোর হইতে উঁকি মারিতেছে, কিন্তু ভয়ে এ গোলে আসিতে পারিতেছে না। অতএব দাদা কিছু ক্ষণের জন্য খেলা ছাড়িয়া একবার বোনটীর কথা শুনিতে দৌড়িলেন।

বোনটী দ্বারের পাশে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া এক একবার উঁকি মারিতেছিলেন—রৌদ্রে গাল লাল হইয়া উঠিয়াছিল, টুকটুকে ঠোঁট দুখানি শুকাইয়া গিয়াছিল। দাদাকে দেখিয়া সেই রক্তিম গণ্ডে শুষ্ক ওষ্ঠের ক্ষীণ মধুর হাসিটুকু আপনি উছলিয়া উঠিল। প্রভা অতি ধীরে ছোট ছোট কথায় বলিল, "দাদা, অমন রাঙ্গা মানুষ কেমন করে হলি ভাই?"

দাদা হাসিয়া বোনটীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন—আঁচলে আবীর ছিল, এক মুঠা সংগ্রহ করিয়া বলিলেন—"তুইও রাঙ্গা মানুষ হবি ভাই বোনটী?"

কিন্তু বোনটী দাদার হাতে আবীর দেখিয়া ভয়ে চক্ষু মুদিলেন—ছোট ছোট দুটি হাতে বড় বড় চোক দুটী ঢাকিয়া বলিলেন "না!" লোকনাথ উচ্চ হাসিয়া প্রভার মাথায় আবীর দিল,—চক্ষু খুলিয়া দিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, কেন তাহাকে ডাকিতেছে! প্রভা হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বলিল যে মা ডাকিতেছে! তখন ভাই বোনে হাত ধরাধরি করিয়া মার কাছে গেল।

লোকনাথের সে লাল মূর্ত্তি দেখিয়া কুটুম্বিনী বালিকা ও বধূর সঙ্গে সঙ্গে হৈমবতীও হাসিয়া উঠিলেন। বধূটীর হাসি কক্ষে কক্ষে তরঙ্গায়িত হইল—তাহাতেও হৈম অপ্রতিভ

কেননা তাঁহার হাসি "কদাচ অধর বিনে অন্য দিকে ধায় না।" তিনি লোকনাথকে ধরিয়া গামছা দিয়া মাথা মুছিয়া দিলেন। ছেলে সে বন্ধন হইতে পলাইবার জন্য নানা ফন্দী করিতে লাগিল, নাকিসুরে কাঁদিতে লাগিল—বলিল—"মা বুঝি এই জন্যই তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। আর মার কোন কথা শুনিবে না।" গা মুছাইয়া হৈম ছাড়িয়া দিলে লোক এক লাফে আঙ্গিনায় গিয়া দাঁড়াইল—সঙ্গে সঙ্গে মাও বারান্দায় আসিলেন। এবং ধীরে ধীরে আদর করিয়া ছেলেকে আবার কাছে ডাকিলেন। লোকনাথ অনেক আপত্তির পর আসিল,—তখন বলিলেন, "সোণা ছেলে আমার, একটী কথা বলি শোন।"

লোক। খেলা ছাড়িয়া এখন আমি কিছু শুনিতে পারিব না।

হৈম। বাপ্ আমার—সমস্ত দিন ত খেলিতেছ। একবার ফকীরের মাকে দেখে এস, আর আমি সিধা দিতেছি, কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেও। রাত থেকে কাঁদচে—তোমার কি মায়া হয় না ?

মার ছেলে, কাজেই মনটা ভিজিয়া গেল। দুঃখিত হইয়া বলিল—"আমি যাব না মা! ফকীরের মার কান্না শুনিলে আমারও বড় কান্না পায়—ফকীরের সঙ্গে খেলা ধুলো সব মনে পড়ে।"

এবার হৈমর চক্ষে জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া ছেলেকে বলিল—"তবে তোমার হরি দাদাকে একবার আমার নাম করে ডেকে দাও, তা ত পারবে লক্ষী বাপ্ আমার ?"

লোকনাথ ছুটিয়া বাহিরে গেল এবং যেখানে হরিদাস কাজের সাগরে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছে—কাহার ডাকে উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছে না—সেই খানে গিয়া হাজির হইল। অনেকে ছোট ঠাকুরকে প্রণাম করিল। হরি লুচির ময়দা তৈয়ার করিয়া দিয়া এইমাত্র কাহার কলিকা কাড়িয়া লইয়া তাড়াতাড়ি একটা টান দিতেছিল,—লোক একেবারে তাহার ঘাড়ে উঠিয়া বসিল। বলিল, "হরে দাদা, মা তোকে একবার ডাক্‌চে।"

হরি। কেনরে ভাই! কাকে বুঝি খেতে দিতে হবে? ভিখারীর পাল বুঝি জুটেছে ?

লোক। তা নয়—তুই একবার যা ত! দেরি করিস্ নে।

হরি। আচ্ছা—যাচ্চি, তোকে এমন রাঙ্গা ভূত সাজালে কে রে লোকা দাদা? চ বাবাকে দেখিয়ে আনি।

"তুই এমনি সাজ্‌বি হরে দাদা"—এই বলিয়া লোকনাথ আঁচল হইতে মুষ্টি মুষ্টি আবীর লইয়া হরিদাসের মাথায় ছড়াইয়া দিল—আর দাঁড়াইল না।

মাথা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হরিদাস অন্দরে প্রবেশ করিল এবং প্রভার অন্বেষণ করিতে লাগিল, কেননা মাঠাকুরাণী তাহার সহিত কথা কন না—সমুখে পর্য্যন্ত বাহির হন না। প্রভা ঘরের বাহির হইয়াই হরিকে ফাগুরঞ্জিত দেখিয়া হাসিল, ডাকিয়া বলিল "মা, দাদা হরে দাদাকেও রাঙ্গা করে দিয়েচে।"

হরি সোপানের নীচে মাঠাকুরাণীর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল, বলিল "পরভা দিদি, মা ডেকেছেন কেন?—দুঃখী কাঙ্গালী বুঝি জুটেছে?"

মা শিখাইয়া দিলেন যে বল তোর হরি দাদাকে, একবার ফকীরের মাকে দেখিয়া আসিতে। বুঝাইয়া সুঝাইয়া তার কান্না যেন থামাইয়া আসে আর ভাল করিয়া যেন একটা সিধা তাকে দেয়। প্রভা আধ আধ কথায় হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অনেক চেষ্টায় হরে দাদাকে একথা গুলি বলিল। ফরমায়েসটা যে এমনি কিছু রকমের, হরি পূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়াছিল। অতএব হাসিয়া বলিল—

"মার যত মায়া বাইরের লোককে,—বাড়ীর ছেলেরা যে ক্ষিধেয় মরে, তা একবার দেখা নাই!"

শুনিয়া হৈম বড় লজ্জিত হইল—লজ্জায় মুখ লাল হইয়া উঠিল। প্রভা তার শিক্ষা মত বলিল—"হরে দাদা, তুমি কি খাবে, মা সুধাইতেছে!"

"কেন ছাঁচ আর ফুটকড়াই?—ও বেলা সে সব হবে!" এই বলিয়া হাসি হাসি মুখে হরিদাস বাহিরে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে জগন্নাথ বাড়ীর ভিতর আসিলেন। হরিকে দেখিয়া স্মিত মুখে বলিলেন—"কি হরি, প্রভার সঙ্গে কি কথা হইতেছিল?"

হরি নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিল—"মা ডেকেছিলেন একবার!"

জগ। কেন?

হরি। একবার ফকীরের মাকে দেখে আস্‌তে।

জগ। কেন গা?—তার হয়েচে কি?

হরি। ফকীরটা যে মারা গ্যাছে—কেন আপনি তা শোনেন নি! আমরা তখন প্রবাসে! রাত থেকে মাগী কাঁদচে,—আহা!

জগ। আমি তা জান্‌তাম না—এমন নির্ঘাতও হয়! বিধাতা কখন কার কি করেন! তা যাও একবার দেখে এস। আমাদের নাম করে সান্ত্বনা করো—কাল আমি নিজে যাব। কিছু খাবার পাঠিয়ে দিও। একটু শীঘ্র ফিরিও—এ দিকেও অনেক কাজ।

হরি চলিয়া যায়, এমন সময়ে প্রভু আবার ডাকিলেন। হরি আসিলে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া দিলেন যে "নাপিত বৌকেও কিছু খাবার যেন দেওয়া হয়। আহা, বেচারী আমার কাছে অনেক কাঁদিয়া গেছে—দিদি তাকে জবাব দিয়েছেন, কিন্তু দেখো, তিনি যেন কিছু জানিতে না পারেন। বুঝিলে?" হরি সবটুকু বুঝিল না, কিন্তু সেই নিভৃত কক্ষে অবগুণ্ঠনের ভিতর সকলই বুঝিল—হৈমবতী। দর্পণবৎ উভয়ের হৃদয়—উভয়ে উভয় প্রতিবিম্বিত হয়।

—(•)—

শ্রীচরণেষু।

তবে আর কি! তবে সমস্ত চুলায় যাক্। বাঙ্গলা দেশ তাহার আম কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতেই থাকুক্। ইস্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ কর, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্ব্বক স্থগিত কর, ইংরাজি পড়া একেবারেই বন্ধ কর, বিজ্ঞান শিখিও না, যে সমস্ত মহাত্মা মানব জাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস পড়িও না, পৃথিবীর যে সকল মহৎ অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানব জাতিকে বিনাশ বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া থাক। অর্থাৎ যাহাতে করিয়া হৃদয় জাগ্রত হয়, মনে উদ্যমের সঞ্চার হয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়া একত্রে কাজ করিবার জন্য অনিবার্য্য আবেগ উপস্থিত হয়—সে সমস্ত হইতে দূরে থাক। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়, কোন্ দিন বার্ত্তাকু নিষেধ ও কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতিদিন সমালোচনা কর। দালান, ডাবাহুঁকা, নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ নিদাঘ-মধ্যাহ্ন অতিবাহিত কর। সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মত ভক্ষণের যোগাড় করিয়া রাখ।

দাদা মহাশয়, তুমি কি সত্য সত্যই বলিতেছ, আমরা একশত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, অবিকল সেইরূপ থাকাই ভাল, আর কিছুমাত্র উন্নতি হইয়া কাজ নাই। জ্ঞান লাভ করিয়া কাজ নাই, পাছে প্রবল জ্ঞানলালসা জন্মিয়া আমাদের দুর্ব্বল দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলে! লোকহিতপ্রবর্ত্তক উন্নত উপদেশ শুনিয়া কাজ নাই পাছে মানবহিতের জন্য কঠোর ব্রত পালন করিতে গিয়া এই প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা শুষ্ক হইয়া যাই। বড় লোকের জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া কাজ নাই, পাছে এই মশকের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে বড় লোক হইবার দুরাশা জাগ্রত হয়! তুমি পরামর্শ দিতেছ ঠাণ্ডা হও, ছায়ায় থাক, গৃহের দ্বার রুদ্ধ কর, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও, এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখনিদ্রার আয়োজন কর।

কিন্তু এখন পরামর্শ দেওয়া বৃথা—সাবধান করা নিষ্ফল। বাঁশির ধ্বনি কানে আসিয়াছে, আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানব জাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে। বৃহৎ মানব আমাদিগকে ডাকিয়াছে, তাহার সেবা করিতে না পারিলে আমাদের জীবন নিষ্ফল। আমাদের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, বাৎসল্য,

দাম্পত্যপ্রেম সমস্ত সে চহিতেছে, তাহাকে যদি বঞ্চিত করি তবে আমাদের সমস্ত প্রেম ব্যর্থ হয়, আমাদের হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকে। যেমন বালিকা স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যতই স্বামী প্রেমের মর্ম্ম অবগত হইতে থাকে, ততই তাহার হৃদয়ের সমুদয় প্রবৃত্তি স্বামীর অভিমুখিনী হইতে থাকে, তখন শরীরের কষ্ট, জীবনের ভয়, বা কোন উপদেশই তাহাকে স্বামীসেবা হইতে ফিরাইতে পারে না, তেমনি আমরা মানব প্রেমের মর্ম্ম অবগত হইতেছি এখন আমরা মানব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব, কোন দাদা মশায়ের কোন উপদেশ তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। মরণ হয় ত মরিব, কোন উপায় নাই। কি সুখেই বা বাঁচিয়া আছি!

আনন্দের কথা বলিতেছ! এই ত আনন্দ! এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন—এই ত আনন্দ! আনন্দের লক্ষণ কি কিছু ব্যক্ত হইতেছে না, জাগরণের ভাব কি কিছু প্রকাশ পাইতেছে না! বঙ্গসমাজের গঙ্গায় একটা জোয়ার আসিতেছে বলিয়া কি মনে হইতেছে না! তাই কি সমাজের সর্ব্বাঙ্গ আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই! আমাদের এ দেশ নিরানন্দের দেশ, আমাদের এদেশে রোগ শোক তাপ আছে, রোগ শোকে নিরানন্দে আমরা জীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছি—সেই জন্যই আমরা আনন্দ চাই, জীবন চাই—সেই জন্যই বলিতেছি নূতন স্রোত আসিয়া আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ের স্বাস্থ্য বিধান করুক্—মরিতেই যদি হয় ত যেন আনন্দের প্রভাবেই মরিতে পারি!

আর, মরিব কেন! তুমি এম্‌নি কি হিসাব জান যে, একেবারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছ যে, আমরা মরিতেই বসিয়াছি! তোমার বুড়োমানুষের হিসাব অনুযায়ী মনুষ্য-সমাজ চলে না। তুমি কি জান, মানুষ সহসা কোথা হইতে বল পায়, কোথা হইতে দৈবশক্তি লাভ করে! মনুষ্য সমাজ সাধারণতঃ হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক-এক সময়ে সেখানে যেন ভেল্কী লাগিয়া যায় তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয়, সহসা এক দিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়, তখন বুড়োমানুষরা চক্ষু হইতে চষমা খুলিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। সহসা যখন নূতন ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত্ত রচনা করে তখনই সেই ভেল্কি লাগিবার সময়—তখন যে কি হইতে কি হয় ঠাহর পাইবার যো নাই। অতএব আঁব বাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।

হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভাল। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রমোয়েল যখন ইংলণ্ডের দাসত্ব রজ্জু ছেদন করিতে ছিলেন, তখন তিনি মরিতেও পারিতেন বাঁচিতেও পারিতেন, ওয়াষিংটন যখন আমেরিকায় স্বাধীনতার ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন বাঁচিতেও পারিতেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এমন কেহ মরে কেহ বাঁচে—তাহাতে আপত্তি কি! নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা, না হয় বাঁচিব, না হয় মরিব—তাই বলিয়া কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া দাদা মশা-

য়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না। তোমার কি ভয় হয় পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে! জিজ্ঞাসা করি, এখনই বা কে বাতি দিতেছে! সমস্তই যে অন্ধকার!

বিদায় লইলাম দাদা মহাশয়। আমাদের আর চিঠি পত্র চলিবে না। আমাদের কাজ করিবার বয়স, সংসারে কাজের বাধা যথেষ্ট আছে—পদে পদে বিঘ্নবিপত্তি, তাহার পরে বুড়োমানুষদের কাছ হইতে যদি নৈরাশ্য সঞ্চয় করিতে হয় তাহা হইলে যৌবন ফুরাইবার আগেই বৃদ্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে পঞ্চাশে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না। তুমি বলিতেছ পথের মধ্যে খানা আছে ডোবা আছে সেইখানে পড়িয়া তুমি ঘাড় ভাঙ্গিয়া মরিবে, অতএব ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া থাকাই ভাল—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। আমি দুর্ব্বল সত্য, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি ত বল পাইতেছি না, আমার ব্রতপালনের পক্ষে আমি হীন বুদ্ধি বটে, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি ত বুদ্ধি পাইতেছি না, অতএব আমার যে টুকু বল যে টুকু বুদ্ধি আছে তাহাই সহায় করিয়া চলিলাম, মরিতে হয় ত চিরজীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিব।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণঃ।

চিরঞ্জীবেষু।

ভায়া, তোমার চিঠিতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের রক্তের তেজ আছে; মাঝে মাঝে তোমরা যে গরম হইয়া উঠ, ইহা দেখিয়া আমাদের আনন্দ বোধ হয়। আমাদের মত শীতল রক্ত যদি তোমাদের হইত তাহা হইলে পৃথিবীর কাজ চলিত কি করিয়া? তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র মেরুপ্রদেশে পরিণত হইত।

অনেক বুড়ো আছে বটে, তাহারা পৃথিবী হইতে যৌবন লোপ করিতে চায়, তাহাদের নিজ হৃদয়ের শৈত্য সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হয় এই তাহাদের ইচ্ছা। যেখানে একটু মাত্র তা'ত পাওয়া যায়, সেইখানেই তাহারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়া সমস্ত জুড়াইয়া হিম করিয়া দিতে চাহে। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে কাঁচাচুল আগাগোড়া উৎপাটন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা পাকা চুল বুনানি করিতে চায়। তাহারা যে এককালে যুবা ছিল

তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়, এই জন্য যৌবন তাহাদের নিকটে একেবারে দুর্বোধ হইয়া পড়ে। যৌবনের গান শুনিয়া তাহারা কানে আঙুল দেয়, যৌবনের কাজ দেখিয়া তাহারা মনে করে পৃথিবীতে কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শ্যামল কিশলয়ের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া ধূলাশায়ী জীর্ণ পত্র যেমন অত্যন্ত শুষ্ক পীত হাস্য হাসিতে থাকে, অপরিণত যৌবনের সরস শ্যামলতা দেখিয়া অনেক বৃদ্ধ তেমনি করিয়া হাসিয়া থাকে। এই জন্যই ছেলে বুড়োর মাঝখানে এত দৃঢ় ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে।

আমার কি ভাই সাধ যে, কেবল কতকগুলো উপদেশের ধোঁয়া দিয়া তোমাদের কাঁচা মাথা একদিনে পাকাইয়া তুলি! কাজ করিতে যদি পারিতাম তা হইলে কি আর সমালোচনা করিতে বসিতাম! তোমরা যুবা, তোমাদের কত সুখ আছে বল দেখি; আমাদের উদ্যমের সুখ নাই, কর্ম্মানুষ্ঠানের সুখ নাই, একমাত্র বকুনির সুখ আছে, তাহাও সম্মুখের দন্তাভাবে ভাল রূপে সমাধা হয় না, ইহাতেও তোমরা চটিলে চলিবে কেন?

কাজ নাই ভাই, আমার সংশয় আমার বিজ্ঞতা আমার কাছেই থাক্, তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ কর, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। নূতন নূতন জ্ঞানের জন্য অনুসন্ধান কর, সত্যের জন্য সংগ্রাম কর, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া চিরজীবন লাভ কর। যে স্রোতে পড়িয়াছ, এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতি-তীর্থের দিকে ধাবমান হও, নিমগ্ন হইলে লজ্জার কারণ নাই, উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে, তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি ধন্য হইবে।

আমি যে চিরজীবন কাটাইয়া অবশেষে যাবার মুখে তোমাদের দুটো একটা কথা বলিয়া যাইতেছি, তাহা শুনিলে যে তোমাদের উপকার হইবে না, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহার সকল কথাই যে বেদবাক্য তাহা নহে, কিম্বা তাহার সকল কথাই যে এখনকার দিনে খাটিবে তাহাও নহে, কিন্তু ইহা নিঃসংশয় যে তাহাতে কিছু না-কিছু সত্য আছেই, আমার এই সুদীর্ঘ জীবন কিছু সমস্ত ব্যর্থ, সমস্ত মিথ্যা নহে; এই সংশয়াচ্ছন্ন সংসারে আমার দীর্ঘ জীবন যে, সত্য পথ-নির্দ্দেশের কিছু মাত্র সহায়তা করিবে না তাহা আমার মন বলিতে চায় না। এই জন্য, আমি কোন দৃঢ় অনুশাসন প্রচার করিতে চাই না, আমি বলিতে চাই না আমার কথা সমস্ত আগাগোড়া পালন না করিলে তোমরা উচ্ছন্ন যাইবে, আমি কেবল এই বলিতে চাই আমার কথা মনোযোগ দিয়া শোন, একেবারে কানে আঙুল দিও না, তার পরে বিচার কর, বিবেচনা কর, যাহা ভাল বোধ হয় তাহা গ্রহণ কর। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিও না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখ।

আমার ত ভাই যাবার সময় হইয়াছে। "যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনা-মাবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোঽর্কঃ।" আমরা সেই অস্তগামী চন্দ্র, আমরা রজনীতে বদ্ধ

ভূমির নিদ্রিতাবস্থায় বিরাজ করিতেছিলাম; তখন যে একটি সুগভীর শান্তি ও সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্য ছিল তাহা অস্বীকার করিবার কথা নহে, কিন্তু তাই বলিয়া আজ এই যে কর্ম্ম-কোলাহল জাগাইয়া অরুণোদয় হইতেছে, ইহাকে সাদর সম্ভাষণ না করিব কেন? কেন বলিব তীক্ষ্ণপ্রভ দিবসের প্রয়োজন নাই, রজনীর পরে রজনী ফিরিয়া আসুক্? এস অরুণ, এস, তুমি আকাশ অধিকার কর, আমি নীরবে তোমাকে পথ ছাড়িয়া দিই। আমি তোমার দিকে চাহিয়া ক্ষীণহাস্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি। আমার নিদ্রা, আমার শান্ত নীরবতা, আমার স্নিগ্ধ হিমসিক্ত রজনী আমার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়া যাক্, তোমারই সমুজ্জ্বল মহিমা জীবন বিতরণ করিয়া জলেস্থলে চরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক!

আশীর্ব্বাদক

শ্রীষষ্ঠিচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

সত্য।

সরল রেখা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যক। দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না। আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের প্রতি আমরা অনেক সময়ে মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকি—আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলি, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। সত্যের যেন বাস্তবিক কোন দাওয়া নাই তাই আমার অনুগ্রহের উপরে সে দাবী করিতে আসিয়াছে, এবং আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহত্বাভিমান অনুভব করিলাম। এইরূপে সত্যের চেয়ে বড় হইতে গিয়া আমরা সত্যকে দূর করিয়া দিই, মিথ্যাকে আহ্বান করিয়া আনি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সত্য সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, এ জন্য সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ বা তোষামোদের বশ নহে। আমার সুবিধামত আমি যদি সত্যকে বাঁকাইতে পারিতাম ত সত্য কি সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল সুন্দর মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে—সত্য আমার মুখ তাকাইলে চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এই জন্যই সত্যের এত বল! সত্য আমার প্রতি নির্ভর করে না বলিয়াই আমি

সত্যের প্রতি নির্ভর করিতে পারি। সত্যকে যদি আবশ্যকমত বাঁকান' যাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম কি করিয়া! সত্য যদি কথায় কথায় স্থান পরিবর্ত্তন করিত তবে আমরা দাঁড়াইতাম কিসের উপরে! সত্য যদি না থাকে তবে আমরা আছি কে বলিল!

আমরা যখন মিথ্যাপথে চলি, তখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি এই জন্য। তখন আমরা আত্মহত্যা করি। তখন আমরা একেবারে আমাদের মূলে আঘাত করি। আমরা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসি। যতখানি আমাদের মিথ্যা অভ্যাস হয় ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যার বশে আমরা কমিয়া আসি। কারণ সত্যরাজ্যের সীমানা কোথাও নাই। দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, আত্মপর প্রভৃতি যে সকল ব্যবধানকে আমরা পাষাণ প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম, সহসা সত্যের বিদ্যুতালোকে দেখি তাহারা কোথাও নাই। তাহারা আমার কল্পনায়। তাহারা অসীম সত্যরাজ্যের কাল্পনিক সীমানা, বালুকার উপরে মানুষের অঙ্গুলির চিহ্ন। তাহারা ছেলে ভুলাইয়া আমার অধিকার সংক্ষেপ করিতেছে। মিথ্যা আমাদিগকে এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুঠারাঘাতে প্রতিদিন আমাদিগকে ছেদন করিতে থাকে। মিথ্যা আমাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়—আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। এমন ঘোর দারিদ্র্য জন্মাইয়া দেয় যে, পৃথিবী-সুদ্ধকে দরিদ্র দেখি, অন্নপূর্ণাকে অন্নহীনা বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল আমরা প্রতিদিন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে কি মনে করি না যে, ন্যূনাধিক প্রবঞ্চনা ব্যতীত পৃথিবীর কাজ চলিতে পারে না, খাঁটি সত্য ব্যবহার কেতাবে পড়িতে যত ভাল শুনায় কাজের বেলায় তত ভাল বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিয়মের উপর সমস্ত জগৎ নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া আছে, সে নিয়মের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না; মনে হয় আমার ভার সে সামলাইতে পারিবে না—চন্দ্র সূর্য্য তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিন মিথ্যার জাল রচনা করিয়া আমরা সত্যকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছি যে, আমাদের স্থূলে ভুল, মূলে অবিশ্বাস জন্মায়—মনে হয় জগতের গোড়ায় গলদ্। এই জন্যই আমাদের ধারণা হয় যে, কেবল কৌশল করিয়াই টিঁকিতে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ডাল পালা মনে করে আমি কৌশল করিয়া থাকিব, গুঁড়িতে সংলগ্ন হইয়া থাকা কোন কাজের নহে; গুঁড়ি বলে আমার শিকড় নাই, কোন প্রকার ফন্দী করিয়া সীধা থাকিতে হইবে। দুই পা বলে মাটিকে নিতান্ত মাটি জ্ঞান করিয়া আমি আপনারই উপরে

দাঁড়াইব; সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা লম্ফ দেয়, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্য সমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা ব্যবসায়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে! চক্ষের উপরে চতুর্দ্দিক হইতে ধূলাবৃষ্টি হইতেছে—আমরা সত্যকে দেখিব কি করিয়া! আমরা জন্মাবধিই গুটিপোকার মত সামাজিক গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ পুরাতম দৃঢ় মিথ্যাসূত্রে সেই গুটি রচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথাকে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে, বলপূর্ব্বক আমাদিগকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেছে, পাছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই—বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে মিথ্যা মান, মিথ্যা মর্য্যাদার কাছে পদানত করিতেছে; মিথ্যা কথন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্ত্তব্যের মত করিয়া শিক্ষা দিতেছে! আমরা বলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক;—স্নায়ুর বিকার ঘটিলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি একরূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অন্যরূপে চালিত হয়—তেমনি বিকৃত শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ শুনি একরূপ, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই। প্রথা বলে অন্যায়াচরণ কর পাপাচরণ কর তাহাতে হানি নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করিও না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্য্যাদা নষ্ট হইবে—অতি পুরাতন মান, অতি পুরাতন মর্য্যাদা, সত্য তাহার কাছে কিছুই নয়। এই সকল সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে মহৎলোকেরা আসিয়া মান মর্য্যাদা কুলশীল চিরন্তন প্রথা, সমাজের সহস্র মিথ্যাপাশ সকল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কারাবাসী মুক্তি লাভ করে। কেবল প্রথার প্রিয় সন্তান সকল, বহুকাল শৃঙ্খলের আলিঙ্গনে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে যাহাদের প্রেম জন্মিয়াছে, বিমল অনন্ত মুক্ত আকাশকে যাহারা বিভীষিকার স্বরূপে দেখে, তাহারাই তাহাদের ভগ্ন কারাপ্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বক্ষে লইয়া মুক্তিদাতাকে গালি দেয় ও ভগ্নাবশেষের ধূলিস্তূপের মধ্যে পুনরায় আপনার অন্ধকার বাসগহ্বর খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ ধাঁদার মধ্যে পড়িয়া আমি সত্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নানা রূপে বিচলিত হইলেও চুম্বক শলাকা সরল ভাবে উত্তরের দিকে মুখ রাখে। সত্যের সহিত আত্মার যে একটি সরল চুম্বকাকর্ষণ যোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে যেন রক্ষা করিতে পারি! ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিশ্রাম সংস্পর্শে আত্মার সেই সহজ চুম্বক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়! যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যানুরাগের প্রভাবে চারিদিকের জটিলতা সকল ছিন্ন করিয়া সমাজকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। সংশয় ভয় ভাবনা অবিশ্বাস দূর করিয়াদিয়া দুর্ব্বলকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে।

আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোন জাতি করে কি না জানি না! আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা কথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের সযত্নে ক খ শেখাই, কিন্তু সত্যপ্রিয়তা শেখাই না—তাহাদের একটা ইংরাজি শব্দের বানান-ভুল দেখিলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিদিবসের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করি না। এমন কি আমরা নিজে তাহাদিগকে ও তাহাদের সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলি ও স্পষ্টতঃ তাহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা দিই। আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াইত এত ভীরু! এবং ভীরু বলিয়াই এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুসি মারিতে লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন তাহা নহে—স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়া আমরা এত হীন। আবশ্যক বা অনাবশ্যক মত মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা এত হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্যানুষ্ঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলার্দ্ধ মাত্র অনিষ্ট হয় এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি!

কবি গেটে বলিয়াছেন, মিথ্যা কথা বলিবার একটা সুবিধা এই যে তাহা চিরদিন ধরিয়া বলা যায়, অথচ তাহার সহিত কোন দায়িত্ব লগ্ন থাকে না, কিন্তু সত্য কথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কাজ করিতে হইবে, অতএব বেশীক্ষণ বলিবার অবসর থাকে না। মিথ্যার কোন হিসাব নাই ঝঞ্ঝাট নাই; কিন্তু সত্যের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার একটা হিসাব লাগিয়া আছে, তোমাকে মিলাইয়া দিতে হইবে। লোকে বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কিনা দেখিতে চাই! আমরা বাঙ্গালীরা মিথ্যা বলিতেছি বলিয়াই এত দিন ধরিয়া কাজ না করিয়াও অনর্গল বলিবার সুবিধা হইয়াছে; কাহাকেও হিসাব দিতে প্রমাণ দেখাইতে হইতেছে না—আমরা যদি সত্যবাদী হইতাম তবে আমাদের কাজও কথার মত সহজ হইত। আমরা সত্য বলিতে শিখিলেই আমরা একটা জাতি হইয়া উঠিব—আমাদের বক্ষ প্রশস্ত হইবে, আমাদের ললাট উচ্চ হইবে, আমাদের শির উন্নত হইবে, আমাদের মেরুদণ্ড দৃঢ় সবল ও সরল হইয়া উঠিবে। লাট্ ডাফরিনের প্রসাদে ভলান্টিয়র হইতে পারিলেও আমাদের এত উন্নতি হইবে না। সত্য কথা বলিতে শিখিলে আমরা মাথা তুলিয়া মরিতে পারিব, গুটিসুটি মারিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা দাঁড়াইয়া মরিতে সুখ বোধ হইবে। নিতান্ত ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠায় না ধরিলে যে জাতি মরিতে জানে না, যে জাতি যেমন-তেমন করিয়াই হৌক্ বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে জাতির মূলে অনুসন্ধান করিয়া দেখ তাহারা প্রকৃত সত্যপ্রিয় নহে। মিথ্যায় যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছে সে আর মরিবে কি! সত্যের বলে যে জীবন পাইয়াছে সে অকাতরে জীবন দিতে পারে!

আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের জীবনকে যতটা সত্য বলিয়া অনুভব করি আর কোন সত্যকে ততটা সত্য বলিয়া বোধ করিনা—এই জন্য আমরা এই প্রাণটুকুর জন্য সমস্ত সত্য বিসর্জ্জন দিতে পারি, কিন্তু কোন সত্যের জন্য এই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তাহার কারণ, যাহা আমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত, তাহার জন্য আমরা এক কানাকড়িও দিতে পারি না, কেবল মাত্র যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করি তাহার জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি। মমতার প্রভাবে মা সন্তানকে এতখানি জীবন্ত সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকে, যে, সন্তানের জন্য মা আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। আর, মিথ্যাচারীরা বলিয়া থাকে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।" অর্থাৎ আপনার কাছে আর কিছুই সত্য নহে, দারা সত্য নহে, দারার প্রতি কর্ত্তব্য সত্য নহে!

অতএব, প্রাণ বিসর্জ্জন শিক্ষা করিতে চাও ত সত্যাচরণ অভ্যাস কর। সত্যের অনুরোধে সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন সহস্র ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। উদ্দাম মনকে মাঝে মাঝে কঠোর রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া বলিতে হইবে, আমার ভাল লাগিতেছে না বলিয়াই যে অমুক কাজ বাস্তবিক ভাল নয় তাহা না হইতেও পারে, আমার ভাল লাগিতেছে বলিয়াই যে অমুক জিনিষ বাস্তবিক ভাল তাহা কে বলিল? পাঁচ জনে বলিতেছে বলিয়াই যে এইটে ভাল, এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ওইটে ভাল তাহাও নয়। এইরূপ প্রতিদিন প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজে কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে দমন করিয়া ও লোকভয় বিসর্জ্জন দিয়া চলিলে প্রতিদিন সত্যকে সত্য বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে শিখিব, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সত্যের সহবাসে যাপন করিয়া সত্যের প্রতি আমাদের প্রেম বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন সেই প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করা সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিবে। আর, যাহারা শিশুকাল হইতে সংসারে প্রতিদিন কেবল আপনার সুখ ও পরের মুখ চাহিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে, সুবিজ্ঞ পিতামাতা আত্মীয় স্বজনদের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রতি নিমেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছলনা ও ভীরু আত্মগোপন অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা কি সহসা একদিন সেই বিপুল মিথ্যাপঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নির্ম্মল সত্যের জন্য সমাজের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে পারিবে! তাহাদের সত্যনিষ্ঠা কি কখনও এতদূর বলিষ্ঠ থাকিতে পারে!

মিথ্যাপরায়ণ বাঙ্গালী তবে কি বাস্তবিক সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবে! চতুর্দ্দিকে এই যে কলরব শুনা যাইতেছে, এ কি বাস্তবিক রণসঙ্গীত! নিদ্রিত বাঙ্গালী তবে কি সত্য সত্যই সত্যের মর্ম্মভেদী আহ্বান শুনিয়াছে! এ কথা বিশ্বাস হয় না। যদি বা আমরা সংশয়গ্রস্ত ভীত দুর্ব্বলচিত্তে রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াই যুদ্ধ করিতে পারিব না, বিঘ্ন বিপদ দেখিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিব। যে

বাঙ্গালী স্বজাতিকে স্পষ্ট উপদেশ দেয় যে, ছলনা আশ্রয় করিয়া গোপনে অখাদ্যখাদন প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিলে কোন দোষ নাই, প্রকাশ্যে করিলেই তাহা দূষণীয়, যে বাঙ্গালী এই উপদেশ অসঙ্কোচে শুনিতে পারে, এবং যে বাঙ্গালী কাজেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে সে বাঙ্গালী কখনও ধর্ম্মযুদ্ধের আহ্বানে উত্থান করিবে না! তাহারা দলাদলি গালাগালি ঝগড়াঝাঁটি তর্কবিতর্ক এ সকল কার্য্য পরম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিবে, কপট কৃত্রিম মিথ্যা কথা সকল অত্যন্ত সহজে উচ্চারণ করিবে—তদূর্দ্ধে আর কিছুই নয়। এ কথা কি কাহাকেও বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালীদের একমাত্র বিশ্বাস সেয়ানামীর উপরে! প্রবাদ আছে, "হুজুতে বাঙ্গালী!" বাঙ্গালী মনে করে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম না করিয়াও গোলেমালে কাজ সারিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপন না করিয়াও কৌশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দী করিতে পারিলে মিথ্যার দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এই জন্য বাঙ্গালী কাগজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাগজ দেয় না, কাজ না করিয়াও দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, বিশ্বাস করে না তবু লেখে ও এই উপায়ে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। বাঙ্গালীর জীবনটা কেবল গোঁজা-মিলন। যেখানে সহজে ফাঁকি চলে সেখানে বাঙ্গালী ফাঁকি দিবেই। এইরূপে পৃথিবীকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে!

কেবলি কি বাঙ্গালীকে মিষ্ট মিথ্যাকথা সকল বলিতে হইবে? কেবলি বলিতে হইবে, আমরা অতি মহৎজাতি, আমরা আর্য্য শ্রেষ্ঠ, ইংরাজেরা অতি হীন, উহারা ম্লেচ্ছ যবন! আমরা সকল বিষয়েই উপযুক্ত, কেবল ইংরেজেরাই আমাদিগকে ফাঁকি দিতেছে! বলিতে হইবে ইংরেজ সমাজ স্বেচ্ছাচারিতার রসাতলে গমন করিয়াছে, আর আমাদের আর্য্যসমাজ উন্নতির এমনি চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল যে, তদূর্দ্ধে আর এক ইঞ্চি উঠিবার স্থান ছিল না, তাহাতে আর একতিল পরিবর্ত্তন চলিতে পারে না! এই উপায়ে ক্ষুদ্রের অহঙ্কার ক্রমিক পরিতৃপ্ত করিয়া কি "পপুলার" হইতেই হইবে! আমরা যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমরা জানি না, সেইটেই আমাদের জানা আবশ্যক। আমরা যে কত মস্ত লোক তাহা ক্রমাগতই চতুর্দ্দিক হইতে শুনা যাইতেছে। কর্ণ জুড়াইয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, সুখ স্বপ্নে আপন ক্ষুদ্রত্বকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখাইতেছে! এখন মিথ্যাকথা সব দূর কর, একবার সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! অন্য জাতির কেন উন্নতি হইতেছে এবং আর্য্য শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীজাতিরই বা কেন অবনতি হইতেছে, তাহা ভাল করিয়া দেখ। আমাদের মজ্জার মধ্যে কি হীনত্ব আছে, আমাদের শাস্ত্রের কোন্ মর্ম্মস্থলে ঘুন ধরিয়াছে যাহাতে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইল তাহা ভাল করিয়া দেখ। ইংরেজ সমাজের মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহার ফলে এমন উন্নত সাহিত্য, এমন সকল বীর পুরুষ, স্বদেশপ্রেমী, মানবহিতৈষী, জ্ঞান ও প্রেমের জন্য

আত্মবিসর্জ্জনতৎপর নরনারী ইংরেজ সমাজে জন্মলাভ করিতেছে, আর আমাদের সমাজের মধ্যেই বা এমন কি গুরুতর দোষ আছে যাহার ফলে এমন সকল অলস, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, পল্লবগ্রাহী, মিথ্যা অহঙ্কারপরায়ণ সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাতিতার সহিত তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। ইহাতে উপকার হইতে পারে। আর, আমরাই ভাল এবং ইংরেজেরাই মন্দ ইহা ক্রমাগত বলিলে ও ক্রমাগত শুনিলে ক্রমাগতই মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কোন ফল লাভ হইবে না।

সত্য কথা বলা ভাল আজ আমার এই কথা সকলের পুরাতন ঠেকিতেছে। সত্য চিরদিনই নূতন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে, দুর্ব্বলতাবশতঃ পুরাতন হইয়া যায়। সত্যকে যতক্ষণ সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকি ততক্ষণ তাহা নূতন থাকে, কিন্তু যখন মনের অসাড়তা বশতঃ আমরা সত্যকে কেবল মাত্র মানিয়া লই অথচ মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারি না তখন তাহার অর্দ্ধেক সত্য চলিয়া যায়, সে প্রায় মিথ্যা হইয়া উঠে। যে শব্দ আমরা ক্রমাগত শুনি, অভ্যাসবশতঃ তাহা আর শুনিতে পাই না, তাহা নিঃশব্দতারই আকার ধারণ করে। এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে শুনিতে পায় না, এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন—বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাঁহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে কারণ সত্য তাঁহাদের যথার্থ প্রিয়ধন। আমরা যাহাকে ভাল বাসি সে কি আমাদের কাছে কখনও পুরাতন হয়! তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম তৃপ্তি অথবা অপরিতৃপ্তির সহিত তাহার মুখের প্রতি আবদ্ধ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসের পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাহাকেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে সেইরূপ চিরনূতন প্রিয়বস্তু! আমার কি তেমন সত্যপ্রেম আছে যে, আজ এই পুরাতন যুগে, মানব-সভ্যতা প্রাদুর্ভাবের কত সহস্র বৎসর পরে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া মানব-হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারিব!

যাহারা সহজেই সত্য বলিতে পারে তাহাদের সে কি অসাধারণ ক্ষমতা! যাহারা হিসাব করিয়া পরম পারিপাট্যের সহিত সত্য রচনা করিতে থাকে, সত্য তাহাদের মুখে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইয়া যেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি দুঃসাহসিকতায় ভর করিয়া সেরূপ পারে! অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গায় এমন একটা শব্দ প্রয়োগ, এমন একটা ভাবের গলদ্ করিত, যে তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। প্রাচীন ঋষি সরল

হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়, আবীরাবীর্ম্মএধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" অপরূপ নিয়মে হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেম্‌নি সহজে ঋষি হৃদয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছিল; আজ যদি কেহ হিসাব করিয়া এই প্রার্থনার ভাব সংশোধন করিতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হয়ত তাহাতে এই প্রার্থনা-স্থিত সত্যের সহজ উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যায়। "রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর" প্রার্থনার এই অংশটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব তালি দিয়া লাগান' হইয়াছে—কিন্তু এ কি বাস্তবিক সংশোধন হইল? সরল হৃদয় ঋষি কি মিথ্যা বলিয়াছিলেন? এই প্রার্থনায় ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে সত্যপরায়ণ ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সম্বোধন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে যে, সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন "রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ"—এমন আশ্বাসবাণী আর কি হইতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের আর ভয় কি! যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই আনন্দবারতা প্রচার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অভয়, শাসনের মধ্যে প্রেম বিরাজ করিতেছে। এখানে "দয়াময়" বলিলে এত কথা ব্যক্ত হয় না, সে কেবল একটা কথার কথা হয় মাত্র। তাহাতে রুদ্র ভাবের মধ্যেও প্রসন্নতা, আপাতপ্রতীয়মান অমঙ্গল রাশির মধ্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গল স্বরূপের প্রতি দৃঢ় নির্ভর এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় না। মহর্ষি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রসন্ন দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে আর আমরা বিস্তর তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্ত্তন করিলাম, তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয়। ইস্কুলের পড়ার মত সত্য মুখস্থ করিয়া সত্য বলা যায় না! সত্যের প্রতি ভালবাসা আগে সাধনা করিতে হইবে, ভালবাসার দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সহস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল যদি লোভ ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেও আমাদের তত ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমা-

দিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মানুরাগ, দেশানুরাগ, লোকানুরাগ অনেক সময়ে আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, এই জন্যই সত্যানুরাগকে এই সকল অনুরাগের উপরে শিরোধার্য্য করা আবশ্যক।

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তিজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বল, সত্যাচরণ কর, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফেষা-নের যে, কাহারো বলিয়া সুখ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষিরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিম্‌ন্যাষ্টিক কর, কেহ বলেন সভা কর, আন্দোলন কর, ভারত-সঙ্গীত গান কর, কেহ বলেন মিথ্যা বল মিথ্যা প্রচার কর কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্য কথা বল ও সত্যানুষ্ঠান কর। উপরিউক্ত সকল ক'টার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেই সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশী, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সত্য সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিলে শেষে সত্য ফল পাওয়া যায়, মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সঙ্কুচিত সংশয়গ্রস্ত ক্ষুদ্র ধূলিবিহারী কীটাণু হইয়াছি ইংরেজের মিথ্যা নিন্দা করিলে আমরা বড় হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মস্ত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বেষ করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙ্গিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না, আমরা যে ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকি, খুঁটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখরার ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সরল ও সবল নহি, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাসপরায়ণ নহি। আমরা যে আগাটায় জল ঢালিতেছি, তাহার গোড়া নাই, নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছি কিন্তু তাহার মূলে সত্য নাই, এই জন্য ফল লাভ হইতেছে না। যেমন, যে রাগিণীতে যে গান গাওনা কেন একটা বাঁধা সুর অবলম্বন করিতে হইবে, সেই এক সুরের প্রভাবে গানের সকল সুরের মধ্যে ঐক্য হয়, নানা বিভিন্ন সুর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমনি আমরা যে কাজ করি না কেন সত্যকে তাহার মূল সুর ধরিতে হইবে। আমরা সেই মূল সুর ভুলিয়াছি বলিয়াই এত কলরব হইতেছে, ঐক্য ও শৃঙ্খলায় এত

অভাব দেখা যাইতেছে। এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে কোলাহলই উত্তেজিত করিতেছেন, কেহ মূল সুরের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই—ইহাকে তাঁহারা অলঙ্কারের হিসাবে দেখেন নিতান্ত আবশ্যকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিয়টেরা দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল খেলিতেছেন। এ দিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কার্য্য করিতেছে, সে ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিয়টদিগের কোলাহলময় ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র খাতির করিতেছে না। পেট্রিয়টেরা পদ্মার তীরে দুর্গ নির্ম্মাণে মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মায়াবিনী পদ্মা তাহার অবিশ্রাম খরস্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিয়টদিগের বিস্তৃত আয়োজন সকল সহসা একরাত্রের মধ্যে স্বপ্নের মত অন্তর্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচ জন পেট্রিয়টে মিলিয়া জোড়াতাড়া, তালি, ঠেকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল খেলাইয়া স্থায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না। অনন্তের অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠেলিবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানে চাতুরী আসিয়া কি করিবে! হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না! চিরনবীন চিরবলিষ্ঠ সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অবহেলা করিতেছেন! কিন্তু যাঁহারা জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছেন, যৌবনের পূত হুতাশন যাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে যাহার সহস্র শিখা দীপ্ত তেজে মহত্ত্বের দিকেই অবিশ্রাম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, যাঁহারা বিষয়ের মিথ্যাজালে জড়িত হন নাই, মিথ্যা যাঁহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন প্রার্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর যৌবন লাভ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যাপরায়ণ বিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্য আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের দৃঢ় সূত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে, মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশে মিথ্যা অস্ত্র ব্যবহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরন্তন প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমাদিগকে মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যানুরাগ সত্ত্বেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম

সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদিগকে পুনরায় সত্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র প্রথানুরাগ বা শাস্ত্রানুরাগ বশতঃ যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলিঙ্গন করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি, মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয় হইয়া উঠে, পূর্ব্ব পুরুষ হইতে উত্তর পুরুষে সযত্নে সংক্রামিত হইতে থাকে, এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাশের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয়ের স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে অবশেষে সেই জীর্ণ জর্জ্জর মন্দিরকে সঙ্গে করিয়া ভূমিসাৎ হয়। আমাদের এই দুর্দ্দশাপন্ন ভারতবর্ষ সেই ভূমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। কালক্রমে বন্ধন-জর্জ্জর সত্য এই ভারতবর্ষে এমনি হীনাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল যে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল; স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথার দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপায়ের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অনুশাসন দ্বারা সত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন, মিথ্যার সাহায্য না লইলে সাধারণের নিকটে সত্য গ্রাহ্য হয় না, এবং মিথ্যা বিভীষিকা না দেখাইলে দুর্ব্বলেরা সত্য পালন করিতে পারেনা। মিথ্যার প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস! ইতিহাসে পড়া যায় বিলাসী সভ্য জাতি বলিষ্ঠ অসভ্য জাতিকে আত্মরক্ষার্থ আপন ভৃত্য শ্রেণীতে নিযুক্ত করিত, ক্রমে অসভ্যেরা নিজের বল বুঝিতে পারিয়া মনিব হইয়া দাঁড়াইল। তেমনি সত্যকে রক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাতে ক্রমে মিথ্যাই মনিব হইয়া দাঁড়াইল—সত্যকে মিথ্যার দ্বারস্থ হইতে হইল। সত্যের এইরূপ অবমান দশায় শত সহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের হিন্দুসমাজে হিন্দুপরিবারে নির্ভয়ে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না; তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম, আজ আর উত্থান শক্তি নাই—আজ পঙ্গুদেহে পথ-পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতর স্বরে বলিতেছি "দেও বাবা ভীখ্ দেও!"

গয়া।

বাঁকীপুর হইতে গয়ায় আসিতে বহুদূর পর্য্যন্ত যে দিকে চাও, চারিদিকেই সমতল ক্ষেত্র, চারিদিকেই গম, ছোলা, অহিফেনের চাস্। সেই সকল প্রচুর শস্য সেই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের কেমন এক মোহন পূর্ণভাব কাহার না হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করে? কাহার না মনে হয়, এই অনন্ত শস্যশালিনী ভারতভূমি আজি দরিদ্র, পরমুখপ্রেক্ষিণী হইয়াও

রাজরাজেশ্বরী জগদ্ধাত্রী। ইংরেজ ভারতের হীরাজহরৎ মনি কাঞ্চন, মুক্তাপ্রবাল, পরিধেয় বস্ত্রখানি মুখের গ্রাসটী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া স্বকীয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, ক্রিমলিন্ প্রাসাদ প্রভৃতি শোভিত করিতেছেন, কাহার না মনে হয় এইরূপ সহস্র বৎসর লুণ্ঠনের পরেও যদি ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া দিয়া যান্ তথাপি ভারতের এই মনোমোহিনী জগদ্ধাত্রীরূপ ঘুচিবে না। বাঁকীপুরের পরেই পুন্‌পুন্ ষ্টেসন, ইহা পুণ্যসলিলা পুন্‌পুন্ নদীর তীরে অবস্থিত। গয়ার তীর্থযাত্রীরা পুন্‌পুনে্ স্নান ও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য কোন মহাত্মা বাঁকিপুর হইতে পুন্‌পুন্ পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইনের দুই ধারের রাস্তায় অশ্বত্থবৃক্ষ রোপন করিয়া দিয়াছেন।

এতদঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। ইহারা নিতান্ত দরিদ্র, শুদ্ধ ইহারা কেন, এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই নিতান্ত দরিদ্র। ইহাদের ঘর বাড়ীও অবস্থানুরূপ। লাঙ্গলের বলদগুলা নিতান্ত শীর্ণ—দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় ইহারা ভালরূপ খাইতে পায় না। এখানকার ইতর শ্রেণীর লোকেরা এত দরিদ্র যে দিনান্তে এক মুঠা যাহা কিছু চিবাইয়া জীবন ধারণ করে, একটা সামান্য চেবুয়া (এক পয়সা = ১।০ চেবুয়া) দিলেই ইহারা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হয়। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় না, ভূমিও নিম্ন বঙ্গের মত স্বাভাবিক উর্ব্বরা নহে; এজন্য ইহাদিগকে ভূমির উর্ব্বরতা সাধন, ভূমিতে যথোচিত জলসিঞ্চন প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদা বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয়। মাঠের স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ কূপ আছে, ইহারা তাহা হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে জল দিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নদী হইতে গ্রামের ভিতরে জল আনিবার জন্য ৬।৭ ক্রোশ ব্যাপী সুবৃহৎ পয়ঃ-প্রণালী আছে। ইহা তাহাদের ভূমি জলসিক্ত করিবার প্রধান সহায়। এখানকার জমিদারেরা ঐ সকল কূপ ও পয়ঃপ্রণালী খনন ও সংস্করণ কার্য্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ভূমির হার অপেক্ষাকৃত বেশী বোধ হইল। ইহাদের বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ, সর্ব্বাংশে ইহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী।

গয়া ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত ও দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগে বিচারালয়াদি আছে, অপর ভাগে গয়ালাদিগের বাসস্থান। এক ভাগের নাম সাহেবগঞ্জ। অপর ভাগই নিজ গয়া। সাহেবগঞ্জে দেখিবার অনেক জিনিস্ আছে। তন্মধ্যে রামশীলা, ব্রহ্মযোনি, প্রেতশীলা পর্ব্বতত্রয় আর ঐ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী, বাস্তবিক ঐ সকল দেখিবার সামগ্রী বটে। রামশীলা, ব্রহ্মযোনি ও প্রেতশীলা পর্ব্বতত্রয়ে হিন্দুরা আসিয়া পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন. এ তিনটী পর্ব্বতে উঠিবার সিঁড়ি আছে। ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমুচ্চ। রামশীলা পর্ব্বতটী ফল্গুনদীর উপরেই এই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। টিকারীর রাজা রং বাহাদুর ১০।১২ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে অতি সুন্দর সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া দিতেছেন। সিঁড়ি প্রস্তুত কর্ম্ম প্রায় শেষ

হইয়া আসিল। শিখর দেশে মন্দির আছে, মন্দিরাভ্যন্তরে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে, কথিত আছে বনগমন কালে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা এখানে ছিলেন ও এইখানে পিতৃ পিণ্ড প্রদান করেন। পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী এ প্রদেশটী ঘিরিয়া রাখিয়াছে। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে পক্ষীগণ যেমন আপন আপন নীড় মধ্যে পক্ষ বিস্তার করিয়া শাবকগুলিকে রক্ষা করে, জগন্মাতা প্রকৃতিদেবী যেন সেইরূপ পর্ব্বতপক্ষ বিস্তার করিয়া কি এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সন্তান গুলিকে নিজ বক্ষ মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া চিরপ্রবাহী স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা পোষণ করিতেছে, আর সম্মুখে ঐ ফল্গুনদী যেন সন্তানগণের দুঃখ দারিদ্র্য দেখিয়া শোকে দুঃখে শুষ্ককায়া হইয়াছে—যেন "হিয়ার ভিতরে লুটায়ে লুটায়ে" তাহার প্রাণ কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। পতিপ্রাণা সীতা দেবী, অসামান্য ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এবং ধীর ও সহিষ্ণুপ্রবর মহাপুরুষ রামচন্দ্র এখানে আসিয়াছিলেন, মনে হইলে হৃদয় হর্ষবিষাদ ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। বাস্তবিক এমন মনোহর স্থান কোথাও দেখি নাই—বোধ হয় যেন ঐ মন্দিরের প্রত্যেক পরমাণুতে অপূর্ব্ব কাব্য পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে।

নিজ গয়ার পথ সকল অতি সঙ্কীর্ণ। এই ভাগে অনেক সুন্দর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার অনেকগুলি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই স্থানে বিষ্ণুপাদে হিন্দুরা পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপাদ বিখ্যাত পুণ্যবতী অহল্যাবাই নির্ম্মিত সুরম্য অট্টালিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রতিবৎসর বিশেষত চৈত্রমাসে বহুসংখ্যক যাত্রী আগমন করিয়া থাকে। বিষ্ণুপাদ একটি দেখিবার সামগ্রী, একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডে বিষ্ণুদেবের পদচিহ্ন দেখা যায়। প্রবাদ আছে বিষ্ণুদেব গয়াসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার মস্তকে পদার্পণ করেন। গয়ালীরা এখানকার পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। গয়ালীরা অনেকেই ধনী, বেশ শান্ত ও ভদ্র প্রকৃতিক। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পরমাসুন্দরী। ইহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা আছে, তবে ইহাঁরা যাঁহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট অবরোধ প্রথার নিয়ম রক্ষ করেন না। ইহাঁরা যাত্রীদের বেশ যত্ন করিয়া থাকেন। এস্থান মূল্যবান কৃষ্ণপ্রস্তরের বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ। আহারীয় দ্রব্য সমস্তই অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। দুগ্ধ ঘৃত ও ময়দা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। এখানে ক্ষীরের দ্রব্য অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়। এখানকার তামাকের কথা তামাকসেবী মাত্রেই জানেন। নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন প্রায় সকলেই কূপের জল পান ও স্নানার্থে ব্যবহার করে। ফল্গুর জল ব্যবহার করে না; লোকে বলে ফল্গুর জলে বাত প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। এখানে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা ঐ গয়াসুরের প্রবাদ বাক্য ও গয়ালীদের দুই একটি আচার ব্যবহারে স্পষ্ট বুঝা যায়। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে গয়ালীরা আর বিবাহ করিতে পারেনা, ইহা তন্মধ্যে

একটি। বৌদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করিতে বাধা নাই।

এ প্রদেশে আরো দুইটী দেখিবার স্থান আছে বুদ্ধ গয়া ও বরাবর পর্ব্বত শ্রেণী। বুদ্ধগয়া সাহেবগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে। সাহেবগঞ্জ হইতে বুদ্ধগয়া পর্য্যন্ত বেশ সুন্দর রাস্তা আছে। আমরা বুদ্ধগয়া দেখিবার জন্য প্রাতে ঘোড়ারগাড়ী করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে উদ্যান ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র; উদ্যানে আম্র কাঁঠাল, তাল, খর্জ্জুর, জাম প্রভৃতি শোভা করিতেছে, উদ্যানের পূর্ব্বপার্শ্বেই শুষ্ককায়া ফল্গুনদীর বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে, ফল্গুনদীর অপর পারেই বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণী মেঘের মত আকাশ পটে চিত্রিত রহিয়াছে। আমরা প্রকৃতির ঐ সকল শোভা দেখিতে দেখিতে উৎসুক চিত্তে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই বুদ্ধ দেবের বাসস্থান, সেই প্রকাণ্ড মন্দিরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই মনে হইল বুঝি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পরক্ষণেই বুঝা গেল মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ পর্ব্বতের ন্যায় স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। মন্দিরটি দ্বিতল, প্রায় একতল ভাগ ভগ্নাবশেষ প্রভৃতিতে বুজিয়া ছিল। ঐ স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ দেখিলেই মনে হয় যেন ঐ গুলি ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের অস্থিপঞ্জর। ঐ প্রকাণ্ড সুরম্য মন্দির এখনও ঐ বিজন প্রান্তর প্রান্তে বুদ্ধদেবের আত্মা ও ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অস্থিপঞ্জর বক্ষাভ্যন্তরে রাখিয়া আকাশ এবং কালের উপরে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এত কাল বুদ্ধ দেবের প্রস্তরময়ী ধ্যাননিমগ্ন প্রশান্তমূর্ত্তি ভগ্নাবশেষের সহিত নিহিত ছিল। অত্যল্প দিন হইল লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর ইডেন সাহেবের যত্নে, গভর্ণমেণ্ট কালের পদধূলি ও ভগ্নাবশেষ সকল খনন করিয়া মন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ কিয়দংশ ভূমির প্রথমাবস্থা বাহির করাইয়া দিয়াছেন, এবং মন্দির ও মূর্ত্তি প্রভৃতির জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছেন। যে দুইজন ইংরেজের হস্তে মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার প্রভৃতির ভার আছে, তাঁহারা বলেন চারিদিকের ভগ্নাবশেষ স্তূপ খনন করিলে, আরো কি নূতনতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে কে বলিতে পারে? অর্থের অনং-কুলন বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। মন্দিরের চারিকোণে চারিটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে মন্দিরের সমস্ত কার্য্যই প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দিরের গাত্রে নিম্নতল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত অসংখ্য ধ্যাননিমগ্ন বুদ্ধদেব মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে যে দুইটি মন্দির আছে, তাহা দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। দুই সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই দুইদিকে সম্মুখে বুদ্ধদেবমূর্ত্তি। প্রধান মন্দিরে নিম্নতলে ধ্যান-নিমগ্ন বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, হৃদয় অদ্ভুত পূর্ব্ব ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল। মনে মনে বলিলাম "তুমিই সেই আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী, তুমিই সেই মহাপুরুষ, ইহা তোমারই সেই বাসস্থান, তোমারই সেই শয়নাগার ও বিচরণভূমি—আজি হয় ত তোমার আত্মা এইখানে বিচরণ করিতেছে।

যখন তোমার জন্মভূমি ব্রাহ্মণদিগের কঠোর শাসনে, পীড়নে ও বন্ধনে হাহাকার করিতেছিল তখন তুমি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণাধিকা পত্নী, প্রিয়তম পুত্র, রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া এই জনশূন্য প্রান্তরে আসিয়া পীড়িত মনুষ্যদের মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলে, এই তাহার প্রতিমূর্ত্তি। ঐ প্রশান্ত বিশাল গম্ভীর আকাশ যেমন প্রত্যেক মনুষ্য জীব জন্তু প্রভৃতিকে আপন হৃদয় মধ্যে ভরিয়া আলোক বিতরণ করিতেছে তেমনি তুমিও একদিন আকাশের ন্যায় সমস্ত জীবজন্তুকে হৃদয় মধ্যে ভরিয়া অহিংসা পরমধর্ম্ম এই নূতন আলোক বিতরণ করিয়াছিলে। ঐ নূতন ধর্ম্মালোকে, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, তিব্বত, তাতার, সিংহল প্রভৃতি আলোকিত হইল, ব্রাহ্মণের কঠোর শাসন ও বন্ধন হইতে ভারত কিছু দিনের জন্য মুক্ত হইল। দেব! আমরা পাপী ও ক্ষুদ্র মনুষ্য আমাদের পদধূলায় তোমার বাসস্থান কলঙ্কিত করিব না।" অতঃপর দ্বার দেশ হইতে প্রণাম করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মন্দির মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বুদ্ধদেব যেখানে স্নান করিতেন, সেই পুষ্করিণী তাঁহার ভগ্ন শয়নাগার প্রভৃতি দর্শন করিলাম। মন্দিরের চারিপার্শ্বস্থ প্রাঙ্গনতল প্রায় অধিকাংশই প্রস্তরাচ্ছাদিত। চারিপার্শ্বে কত ভগ্ন মূর্ত্তি, কত মন্দির প্রভৃতি রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। সম্মুখে ও রাস্তার উপরে মন্দিরের মোহন্তের বাসের সুরম্য অট্টালিকা। শুনিলাম মোহন্ত নাকি হিন্দু, বৌদ্ধ নহেন। নিকটে তিনটী মোহন্তের সমাধি মন্দির ও জগন্নাথ দেবের মন্দির।

বরাবর পর্ব্বত গহ্বরে প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। স্থানটি গয়া হইতে একটু দূর ও দুর্গম। উপযুক্ত সঙ্গী অভাবে তথায় যাইতে পারি নাই। পাঠক! যদি বুদ্ধদেবের আবাসভূমি, শান্তির প্রিয় নিকেতন ও প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি দেখিতে চাও তবে একবার এইদিকে আইস।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

অবসাদ।

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও—জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন!
ঢাল' এ হৃদয় মাঝে জলন্ত অনলময় বল!
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন;
নির্জ্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল!

নিদাঘ-তপন শুষ্ক ম্রিয়মান লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হোয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারি দিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই তৃণ তরু,—
নির্জ্জীব হৃদয় মোর ভূমি তলে পড়িছে লুটায়ে;
এস দেবি, এস, মোরে,
রাখ এ মূর্চ্ছার ঘোরে
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাওগো উঠায়ে!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ও গো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া,—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ বনে বাজে সদা আনন্দের গীত!
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন—চেতনা-রহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবী-তলে—অকর্ম্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!
পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্ম্মের অনুষ্ঠান!
দুর্গম উন্নতি পথে পৃথ্বি তরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোদ্যম, অবসন্ন, দুর্ব্বল পথিকে
করগো জীবন দান তোমার ও অমৃত নিষেকে!

বালক।

হেঁয়ালি নাট্য।

অদ্বৈতচরণ চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তামণি কুণ্ডু।

অ। তুমি কে?

চি। আমি আর্য্য, আমি হিন্দু।

অ। নাম কি?

চি। শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু।

অ। কি অভিপ্রায়?

চি। মহাশয়ের কাগজে আমি লিখ্ব।

অ। কি লিখ্বেন?

চি। আমি আর্য্য—আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখ্ব।

অ। আর্য্য জিনিষটা কি মশায়?

চি। (বিস্মিত হইয়া) আজ্ঞে, আর্য্য কাকে বলে জানেন না? আমি আর্য্য, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু আর্য্য, তাঁর বাবা ৺ নফর কুণ্ডু আর্য্য, তাঁর বাবা—

অ। বুঝেছি।—আপনাদের ধর্ম্মটা কি?

চি। বলা ভারি শক্ত। সংক্ষেপে এই প'র্য্যন্ত বলা যায় যে, যা অনার্য্যদের ধর্ম্ম তা আর্য্যদের ধর্ম্ম নয়।

অ। অনার্য্য আবার কারা।

চি। যারা আর্য্য নয় তারাই অনার্য্য। আমি অনার্য্য নই, আমার বাবা শ্রী নকুড় কুণ্ডু অনার্য্য নয়, তার বাবা ৺ নফর ভৌমিক অনার্য্য নয়, তার বাবা—

অ। আর বল্তে হবে না। অতএব যে হেতুক শ্রীনকুড় কুণ্ডু আমার বাবা নন এবং ৺ নফর কুণ্ডুর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমিই হচ্চি অনার্য্য।

চি। তা' স্থির বল্তে পারিনে।

অ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) এ তোমার কি রকম কথা! স্থির বল্তে পারিনে কি? নকুড় আমার বাবা নয় তুমি স্থির বলতে পার না? তুমি কোথাকার কি জাত, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের!

চি। জাতের কথা হচ্চে না, বংশের কথা হচ্চে। আপনিও ত ভুবন-বিদিত আর্য্য বংশে জন্মগ্রহণ—

অ! তোমার বাবা নকুড় কুণ্ডু যে বংশে জন্মেছে আমিও সেই বংশে জন্মেছি! চাষার ঘরে জ'ন্মে তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা!

চি। যে আজ্ঞে, আপনি না হয় আর্য্য না হলেন, আমি এবং আমার স্ত্রী বাবা আর্য্য। হায় কোথায় আমাদের সেই পূর্ব্ব পুরুষগণ, কোথায় কশ্যপ, ভরদ্বাজ, ভৃগু—

অ। এ ব্যক্তি বলে কি? কশ্যপ ত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ—আমাদের কাশ্যপ গোত্রে জন্ম—তোমার পূর্ব্বপুরুষ কশ্যপ ভরদ্বাজ ভৃগু এ কি রকম কথা!

চি। আপনি এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হতেই পারে না। হায়, এ সকল ইংরাজি শিক্ষার শোচনীয় ফল!

অ। ইংরিজি শিক্ষা আপনাতে কি ফলে নি?

চি। আজ্ঞে সে দোষ আমাকে দিতে পারবেন না, স্বাভাবিক আর্য্যরক্তের তেজে আমি অতি বাল্যকালেই ইস্কুল পালিয়েছিলুম।

(হরিহর বাবু এবং অন্যান্য অনেকানেক লেখকের প্রবেশ।)

অ। আসতে আজ্ঞে হোক্। লেখা সমস্ত প্রস্তুত?

হ। এই দেখুন না।

চিন্তা। কি বিষয়ে লিখেচেন মশায়?

হ। নানা বিষয়ে।

চি। আর্য্যদের সম্বন্ধে কিছু লিখেচেন?

হ। না।

চি। আর্য্যদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে—

হ। য়ুরোপীয়েরা আর্য্য জাতি, এবং তাঁহাদের বিজ্ঞান—

চি। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি, এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ আমি প্রমাণ ক'রে দেব। এখনো আর্য্য বংশীয়েরা তেল মাখ্‌বার পূর্ব্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ ক'রে ভূমিতে তিনবার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন?

হ। না।

চি। আপনি?

অ। না।

চি। আপনি জানেন?

১ লে। না।

চি। না যদি জানেন তবে আপনারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা কইতে যান কেন? হাই তোল্‌বার সময় আর্য্যরা তুড়ি দেন কেন আপনারা কেউ জানেন?

সকলে সমস্বরে। আজ্ঞে আমরা কেউ জানিনে।

চি। তবে? এই যে আমাদের আর্য্য মেয়েরা বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে লাগ্‌লে ভূমিতে একবার ঠেকায়, তার কারণ আপনারা কিছু জানেন?

সকলে। কিছু না!

চি। এই দেখুন্ দেখি! এই সকল বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা না করেই অনুসন্ধান না করেই আপনারা বলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অথচ আর্য্যরা হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাখে কেন, এ আপনারা কিছু জানেন না।

হ। আচ্ছা মশায়, আপনিই বলুন। তেল মাখ্‌বার পূর্ব্বে ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ কি?

চি। ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্! আর কিছু নয়। ইংরিজিতে যাকে বলে ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্।

হ। (সবিস্ময়ে) আপনি ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ সম্বন্ধে ইংরাজি বিজ্ঞান শাস্ত্র কিছু পড়েচেন?

চি। কিছু না! দরকার নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা কিম্বা কোন শিক্ষার জন্য ইংরিজি পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই! আমাদের আর্য্যেরা কি বলেন? প্রাণ শক্তি, কারণ শক্তি এবং ধারণ শক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সারণ শক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণ শক্তির উত্তেজনা হয়—এই ত ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজেরা স্নানের পরে যে গায়ে তোয়ালে ঘষে, তার কত হাজার বৎসর আগে আমাদের আর্য্যদের মধ্যে গামছা দিয়ে গাত্র মার্জ্জন প্রথা প্রচলিত ছিল ভেবে দেখুন্ দেখি!

লেখকগণ। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য্য, ধন্য! আর্য্যদের কি বিজ্ঞান-পারদর্শিতা! আর্য্য কুণ্ডু মশায়ের কি গবেষণা!

হ। ভাল মূর্খের হাতেই আজ পড়া গিয়েছে! কিন্তু এ'কে চটিয়ে কাজ নেই। নানা কাগজে লিখে থাকে। শুনেছি না কি এই আর্য্য কুণ্ডু ভদ্রলোকদের বড্ড গাল দিতে পারে। সেই জন্যেই বিখ্যাত।

চি। ঐ দেখুন্—ঐ আর্য্য ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যে ফুল তুল্‌চে কেন তুল্‌চে বলুন দেখি!

অ। পূজার সময়ে দেবতাকে দেবে বলে।

চি। ছি, ছি, আপনারা কিছুই গভীর তলিয়ে দেখেন না। সকালে ফুল তুল্‌তে যখন ঋষিরা অনুমতি করেচেন তখন স্পষ্টই প্রমাণ হচ্চে যে, বাতাসে অক্সিজেন বাষ্প আছে এ তাঁরা জান্‌তেন। তা' যখন জানা ছিল, তখন অবশ্য অন্যান্য বাষ্পের কথাও তাঁরা জান্‌তেন সন্দেহ নেই। এই রকম একে একে অতি স্পষ্ট ক'রে প্রমাণ ক'রে দেওয়া যায়, যে আধুনিক য়ুরোপীয় রসায়ণ শাস্ত্রের কিছুই তাঁদের অগোচর ছিল না। হাই তোল্‌বার সময় তুড়ি দেওয়া কেন? সেও ম্যাগ্নেটিজ্‌ম। উত্তান বায়ুর সঙ্গে আধান শক্তির যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরি-

চালিত নিধান শক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ এই তিনটেকে অতিক্রম করতে থাকে তখন সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রম দশা ঘটে, এমন সময়ে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণ জনিত বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়বতাপ সৌরতাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীব-দেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয় দশা ঘট্‌তে দেয় না। একে বিজ্ঞান বলে না ত কা'কে বিজ্ঞান বলে? অথচ আমাদের আর্য্য ঋষিগণ ডারুয়িনের কোন গ্রন্থই পড়েন নি!

লেখকগণ। আশ্চর্য্য! ধন্য! ধন্য আর্য্য মহিমা! আমরা এতদিন এ সকল কথার কিছুই বুঝতুন না!

হ। (স্বগত) এবং আজও কিছু বুঝতে পারচিনে!

চি। মাটিতে পাখা ঠোকার বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন ত সেও ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্! সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ, বিপ্রকর্ষণ এবং নিকর্ষণ এই ক'টা ভৌতিক ক্রিয়ার যোগে—

অ। রক্ষা করুন মশায় আমার মাথা ঘুরচে। পাখা ঠোকার বিষয়ে আপনি আমার কাগজে লিখ্‌বেন এখন! আপনি অনেক বকেচেন, আপনাকে এক্‌টা পান আনিয়ে দিই।

চি। আজ্ঞে না আপনার এখেনে আমি পান খেতে পারি নে। আপনি আর্য্য-ক্রিয়া কলাপ অনুসরণ করেন না—যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের আর্য্য নাড়িতে কুল-ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে আস্‌চে, সেই শক্তি—

অ। মশায়, থাক্ মশায়, আপনাকে পান দেবনা, আপনি পান নেই খেলেন! অনুমতি করেন ত বরঞ্চ তামাক আনিয়ে দিচ্চি!

চি। তামাক! কি সর্ব্বনাশ! সে আরও খারাপ! উৎকৃষ্ট জাত নিকৃষ্ট জাতের হুকোয় তামাক খায় না কেন? এক জাতি আরেক জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খায় না কেন? আগে আর্য্য অনার্য্যের ছায়া মাড়াতেন না কেন? তার মধ্যে কি বিজ্ঞান নেই? অবশ্য আছে। আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্চি। সেও ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্। উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিনপ্রকার দেহজ বিকিরণ শক্তি—

অ। থামুন্ থামুন্—তামাক দেব না মশায়, কাজ নেই আপনার তামাক খেয়ে! পানও থাক্, তামাকও থাক্—যাতে আপনার সুবিধে হয়, যাতে আপনার দেহজ বিকিরণ শক্তি রক্ষা হয় তাই করুন।

লেখকগণ। ধিক্—অদ্বৈত বাবু, আপনি আর্য্য শ্রেষ্ঠ কুণ্ডু মশায়ের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে দিলেন না!

১ম লে। (দ্বিতীয়ের প্রতি) কুণ্ডু মশায়ের কি অসাধারণ যুক্তি শক্তি ও জ্ঞান! কিন্তু কিছু কি বুঝ্‌তে পারলে ভাই?

২। না ভাই বোঝা গেল না। ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করা যাক্ না। আচ্ছা মশায়, আপনি ধারণ কারণ প্রভৃতি যে সকল শক্তির উল্লেখ করলেন, সে গুলো কি ?

চি। সে গুলো আর কিছু নয়—ইংরিজিতে যা'কে বলে ফোর্স্, যাকে বলে ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্।

লেখকগণ সমস্বরে। ওঃ বুঝেছি!

হ। আজ্ঞে, আমি এখনো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

লেখকগণ। (বিরক্ত হইয়া) বুঝ্‌তে পারচেন না। ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্—ফোর্স্—সোজা কথা! ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্‌ত জানেন ? ফোর্স্‌ত জানেন ? এও তাই আর কি! আর্য্যদের অসাধারণ বিজ্ঞান চর্চ্চা!

১। এ সকল স্পষ্ট বুঝ্‌তে গেলে নানা শাস্ত্র জানা আবশ্যক। মশায়ের বোধ করি, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে।

চি। না, শাস্ত্রটা এখনো পড়া হয় নি। আমি, আমার বাবা, এবং ৺ নকর কুণ্ডু আর্য্য—এই জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন আমি বাহুল্য বিবেচনা করেছি।

২। তা বটে। কিন্তু বিজ্ঞানটা আপনি অবিশ্যি ভাল করেই পড়েচেন।

চি। আজ্ঞে না, আমি চিন্তাশক্তির প্রভাবে আমাদের আর্য্য জাতির হাঁচি কাশি তুড়ি আঙ্গুল-মট্‌কান প্রভৃতি আচার ব্যবহারের নানাবিধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করেছি। আমার বিজ্ঞান পড়া আবশ্যক হয় নি। আপনারা শুনে হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আর্য্য শাস্ত্রের দিব্যি নিয়ে আমি শপথ করতে পারি আমি আর্য্যশাস্ত্র কিম্বা বিজ্ঞান কিছুই পড়িনি। আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীন-চিন্তা প্রসূত!

হ। আজ্ঞে শপথ করবার আবশ্যক নেই—পড়াশুনো আছে এরূপ অপবাদ আপনাকে কেউ দেবে না। বিজ্ঞান জানা থাক্‌লে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনি এত কথা বল্‌তেন না—আপনার স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন রসনার অনেক পরিশ্রম বেঁচে যেত। শ্রোতাদেরও—

চি। তুমি আমাকে এমন কথা বল! আমি হিন্দু আমি আর্য্য শ্রীনকুড় কুণ্ডুর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু আমি তোমাকে কাগজে গাল দেব তা জান ?

হ। তা বরঞ্চ দেবেন—কারণ ভদ্রলোককে গাল দিতে শাস্ত্র অধ্যয়ন কিম্বা বিজ্ঞান শিক্ষার কোন আবশ্যক করে না।

---

* গত মাঘ মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর——আদায়। নিম্নলিখিত পাঠকগণ উত্তর দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র। শ্রীযুক্ত অনন্তলাল ঘোষ। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পুণ্ডরিক। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল।

জাঠ ও বেনে।

(পঞ্জাবী লোক কথা)

পঞ্জাব প্রদেশে কোন এক গ্রামে একজন বেনে বাস করিত। তাহার একটি দোকান ছিল। সে আটা দাল, নুন তেল প্রভৃতি বিক্রয় করিত। এক দিন নিকটবর্ত্তী গঞ্জে আপন দোকানের জন্য জিনিশ পত্র কিনিবার কারণ সে যাইতেছিল। গ্রামের বাহির হইতেই তাহার একজন গরীব জাঠের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেও গঞ্জে যাইতেছিল—গঞ্জে তাহার মহাজন থাকে—মহাজনকে কর্জ্জের টাকার কিয়দংশ দিতে যাইতেছিল। জাঠ বেচারীর প্রপিতামহ তাহার আপন প্রপিতামহের শ্রাদ্ধাদির জন্য একশ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল—সুধে সুধে সে একশ টাকা এখন এক হাজার টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জাঠবেচারী বিষণ্ণ মুখে চলিয়াছিল—মনে মনে ভাবিতেছিল কি উপায়ে কর্জ্জ শোধ করিয়া পৈতৃক জমি টুকু তাহার মহাজনের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবে। এমন সময়ে বেনে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ভাল চৌধুরী, আমি দেখচি তুমি তোমার কঠিন-হৃদয় মহাজনকে টাকা দিতে যাচ্ছ; তোমার জমিটুকু রক্ষা করবার কি কোন উপায়ই হয় না?" জাঠ বলিল, "সাহুজি, তুমিতো সকল কথাই জান—আমার প্রপিতামহ একশ টাকা ধার করেছিলেন, এখন সুধে সুধে সেই একশ এক হাজার হয়েছে; আমি গরীব মানুষ, এক হাজার টাকা কোথা পাব।" বেনে বলিল, "ভাই চৌধুরী মিথ্যে দুঃখ করো না; কপালে যা লেখা আছে তা ঘটবেই। ভাই কপালের দুঃখের কথা বলে আর কি হবে? এসো আমরা গল্প বলতে বলতে আর শুনতে শুনতে যাই, রাস্তার কষ্ট আর তা হলে মনে থাকবে না।" জাঠ বলিল, "সাহুজি, ঠিক বলেছ, কিস্মতে যা আছে তার জন্য দুঃখ করে আর কি হবে। আচ্ছা চল আমরা গল্প বল্‌তে বল্‌তে যাই। তবে তোমার একটা কথা মানতে হবে। আমাদের গল্প যতই কেন মিথ্যা বা অসম্ভব হউক কেহ তাহা মিথ্যা বলতে পারবে না। যে বলবে গল্প মিথ্যা তাহাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে।" বেনে বলিল, "তাই হবে—আমি আমার গল্প আরম্ভ করি।" "তুমি জান, আমার প্রপিতামহ বেনে সমাজে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার ধনের সীমা ছিল না।"

জাঠ বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহুজি, সত্যি বলেছ।"

"চীনে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আমার প্রপিতামহ দেশে ফিরিয়া আসেন—সঙ্গে তিনি অনেক অদ্ভুত ও বহু মূল্য জিনিশ আনেন। তাহার মধ্যে একটি সোনার মনুষ্য মূর্ত্তি ছিল, তাহা এমনি আশ্চর্য্য যে তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর তাহারই সে জবাব দিত।"

জাঠ বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহুজি, সত্যি বলেছ।"

"হাজার হাজার লোক প্রতিদিন ঐ মনুষ্য মূর্ত্তির নিকট প্রশ্ন করিতে আসিত। কদিন তোমার প্রপিতামহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ জাতি সকল অপেক্ষা দ্ধিমান? মনুষ্য মূর্ত্তি উত্তর করিল, 'বেনে জাতি।' তোমার প্রপিতামহ আবার জ্ঞাসা করিল, 'কোন্ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ? উত্তর হইল, 'জাঠ।' তোমার পিতামহ প্রশ্ন করিল; আমার বংশে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ কে হইবে? মনুষ্য মূর্ত্তি ত্তর দিল, 'চৌধুরী লেহারী সিং' (আমাদের নায়ক জাঠের নাম লেহারী সিং)।

জাঠ বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহুজি, সত্যি বলেছ।"

"সোনার মনুষ্য মূর্ত্তির খ্যাতি দেশে বিদেশে রটিল—রাজার কাণেও তাহার কথা ল। রাজা আমার প্রপিতামহকে ডাকিয়া প্রধান মন্ত্রীর কাজ দিলেন আর সোনার নুষ্য মূর্ত্তি চাহিয়া লইলেন।"

জাঠ বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহুজি, সত্যি বলেছ।"

"আমার প্রপিতামহ বহুকাল প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে মার পিতামহ প্রধান মন্ত্রীর কাজ পান। রাজা তাঁহার প্রতি কোন কারণে ক্রুদ্ধ য়া একদিন তাঁহাকে হাতীর পায়ে ফেলিয়া মারিবার আজ্ঞা দেন। রাজ্যের প্রধান ন্ত্রীর প্রাণদণ্ড দেখিবার জন্য রাজ্যের লোক জড় হইল। বধ্যভূমিতে আমার তামহ আনীত হইলেন। তাহার পরে হাতী সেখানে আনা হইল। হাতীকে ড়িয়া দিতেই সে আমার পিতামহকে শুঁড় দ্বারা তুলিয়া লইয়া পিঠে বসাইল।"

জাঠ বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহুজি, সত্যি বলেছ।"

রাজা যখন দেখিলেন পাগলা হাতীও আমার পিতামহের প্রাণনাশ করিল না, খন তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আবার প্রধান মন্ত্রীর কাজ দিলেন। তাঁহার মৃত্যুর র আমার পিতা প্রধান মন্ত্রীর কাজ পাইলেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্য ছাড়িয়া থিবী পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা দেশে তিনি নানা রকম আশ্চর্য্য বস্তু ও জীব খিলেন। একদিন আমার পিতা দেখিলেন একটা মশা তাঁহার কাণের কাছে গুন ণ করিয়া ফিরিতেছে—অবিলম্বে দংশন করিবে। তিনি ভারি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কননা তুমি জান আমরা বেনেরা কোন প্রাণীর হিংসা করিতে পারি না।"

জাঠ বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহুজি, সত্যি বলেছ।"

"আমার পিতা অত্যন্ত কাতর ভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া মশাটার নিকট 'রক্ষা কর, ক্ষা কর,' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মশা প্রসন্ন হইয়া বলিল, 'হে সাহুজি, তোমার মান শক্তিশালী ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই—তোমার আমি একটা মহা পকার করিব। এই বলিয়া মশা আপন মুখ বিস্তার করিল, আমার পিতা দেখিলেন শার মুখগর্ভে একটা প্রকাণ্ড বড় স্বর্ণ নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ, আর সে প্রাসাদের

গবাক্ষপথে এক পরমাসুন্দরী রমণী। কিন্তু আমার পিতার এ আহ্লাদ মুহূর্ত্তকাল রহিল না, কেননা তিনি দেখিলেন একটা চাষা ঐ রমণীরত্নকে অপমান করিবার চে করিতেছে। আমার পিতা ক্রোধে জ্বলিয়া গেলেন, লাফাইয়া মশার মুখে প্রবে করিলেন—তাহার পেটের ভিতরে গিয়া পড়িলেন—দেখিলেন সব অন্ধকার।"

জাঠ বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহুজি, সত্যি বলেছ।"

"কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার মিলাইয়া গেল, আমার পিতা পুনরায় সে রাজপ্রাসাদ, ে রাজকুমারী, ও সে চাষাকে দেখিতে পাইলেন। আমার পিতা চাষাকে যুদ্ধে আহ্বা করিয়া তাহাকে পরাভূত করিলেন। সে পরাভূত চাষা আর কেহ নয়, তোমারই বা চৌধুরী। আমার পিতা রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন—আমার জন্ম সেই রাজ প্রাসাদেই হয়। তোমার বাপ সে প্রাসাদে দ্বারবানের কাজ পাইল। যখন আমা বয়স পোনর বৎসর, তখন একদা আমাদের প্রাসাদের উপর ভয়ানক গরমজলে বৃষ্টি হয়—প্রাসাদ গলিয়া যায়, আমরা এক অতি জলন্ত সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হই অনেক কষ্টে তীর পাই। তীরে উঠে দেখি কি জান? দেখি কিনা আমরা একট রান্না ঘরে, আর রান্নাকারিনী আমাদিগকে দেখে ভয়চকিতা! কিছুক্ষণ পা রাঁধুনী যখন দেখিল যে আমরা মানুষই বটে, ভূত প্রেত নয়, তখন সে বলিল, তোমর তো বেশ লোক হে, আমার দাল খারাপ করলে—ঐ কড়াটায় প্রবেশ করবার তোমা দের কি দরকার পড়েছিল?" আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করে বল্লুম, ঐ কড়াটায় যা ছিলুম তো না জেনেই ছিলুম! আমরা তো জানি যে আজ পোনর বৎসর আমর একটা মশার পেটে একটা রাজপ্রাসাদে ছিলুম। রাধুনী বলিল, আহা, এখন বুঝেছি— ঠিক পোনর মুহূর্ত্ত হলো একটা মশা আমার হাতে কামড়িয়েছিল। তোমরা নিশ্চ মশাটার কামড়ের সঙ্গে আমার হাতে প্রবেশ করেছিলে, আমি দংশিত জায়গাটা থেবে বিষটা আঙ্গুল দিয়ে ফেলতে একটা ফোটা কড়াটায় পড়েছিল—আমি স্বপ্নেও তখ ভাবি নাই তোমরা তারি সঙ্গে কড়ায় পড়বে।' আমার পিতা বলিলেন, "বিবিজি তুমি যা বল্লে তাই ঠিক হবে। তোমার পোনের মুহূর্ত্তই আমাদের পোনর বৎসর হইবে।' বাস্তবিক, আমার বয়স যদিও তখন পোনর মুহূর্ত্ত মাত্র ছিল আমাকে দেখতে পোনর বৎসরের মত দেখাতো।"

জাঠ বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহুজি, সত্যি বলেছ।" "বাহিরে আসিয়া দেখি যে আমরা এই গ্রামে আসিয়াছি। আমার বাপ যিনি ইতিপূর্ব্বে রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন দোকানদারী আরম্ভ করিলেন, আমি, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের কাজকর্ম্ম করিতে লাগি-লাম। রাজকুমারী আমার মা সে দিন স্বর্গে গিয়াছেন, তুমি জান। এই আমার গল্প।"

জাঠ বলিল; "তোমার গল্প সত্য—ইহাতে কিছুই মিথ্যা নাই। আমি যে গল্প বলব তা যদিও সম্পূর্ণ সত্য এতটা অদ্ভুত নয়। এখন আমার গল্প শোন।

"আমাদের গ্রামে আমার প্রপিতামহের সমান আর কেহ বড় মানুষ ছিল না। তাঁহার জমকালো চেহারা, তাঁহার শিষ্টাচার, তাঁহার গভীর জ্ঞানের সকলেই প্রশংসা করিত। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, এবং চৌপালে ও গ্রাম্য সমিতিতে সর্ব্ব-প্রথম আসন তিনিই পাইতেন, সর্ব্বাগ্রে হুকো তাঁহাকেই দেওয়া হইত। তিনি গরীব মাত্রেরই বন্ধু ছিলেন—তিনি সকল গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা করিতেন—তাঁহার হুকুম অমান্য করিতে কেহ সাহস পাইত না। বাস্তবিক, তাঁহার আদেশ বাদশাহের হুকুমের অধিক, কাজীর ফয়সলার অধিক সম্মানিত হইত। তিনি দুষ্টদমন ছিলেন—তাহারা তাঁহার ভয়ে কম্পিত থাকিত—রস্তম ও ভীমসেনের অধিক তিনি শক্তিশালী ছিলেন।"

বেনে বলিল, "সত্যি বলেছ, চৌধুরী, সত্যি বলেছ।"

"একবার দেশে বড় দুর্ভিক্ষ হইল। বৃষ্টি হইল না—নদী ও কূপ শুকাইয়া গেল—তরুলতা জ্বলিয়া গেল। গো মেষ অনাহারে সহস্র সহস্র মরিতে লাগিল। আমার প্রপিতামহ দেখিলেন অচিরে গ্রামবাসী সকল অনাহারে মরিবে। তিনি সকল জাঠকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাই জাঠগণ, নিশ্চয়ই ইন্দ্রদেব আমাদের উপর চটিয়াছেন, না হলে বৃষ্টি বন্ধ করিবেন কেন? আমি দেখচি, উপায় না করিতে পারিলে শীঘ্রই আমাদের সকলকে অনাহারে মরিতে হইবে। তোমরা যদি আমার কথা শোন তবে আমি তোমাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারি। তোমরা সকলে আপন আপন জমি ৬ মাসের জন্য ছাড়।' 'রাজি,' 'রাজি,' সকল জাঠ বলিয়া উঠিল। আমার প্রপিতামহ শক্ত করে অমনি কোমরে কাপড় বেঁধে গ্রাম ধরিয়া এক টানে মাথায় বসাইলেন।"

বেনে বলিল, "সত্যি বলেছ চৌধুরী, সত্যি বলেছ।"

"আমার প্রপিতামহ তার পর গ্রামটা মাথায় করে, বৃষ্টির তাল্লাশে বাহির হইলেন। যেখানে দেখিলেন বৃষ্টি হইতেছে সেখানেই তিনি গ্রাম মাথায় লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। গ্রামের মাঠে, কূপে, পুকুরে রাশি রাশি বৃষ্টির জল ধরিলেন। আমার প্রপিতামহ তার পর দেশে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে গ্রামটাকে নামাইলেন। জাঠদিগকে চাষ বাস করিতে হুকুম দিলেন। এমন ফসল কেহ কখনো দেখে নাই। গমের শির আকাশের সমান উঁচু হইয়া উঠিল, এক একটা গমের দানা তোমার মাথার সমান বড় হইয়া উঠিল।"

বেনে বলিল, "সত্যি বলেছ, চৌধুরী, সত্যি বলেছ।"

"এত ফসল হইল যে দেশ বিদেশ হইতে তাহা কিনিবার জন্য হাজার হাজার লোক আসিতে লাগিল। আমার প্রপিতামহ রাশি রাশি অর্থ লাভ করিলেন। তোমার প্রপিতামহ আমার প্রপিতামহের চাকুরি করিত—দিন রাত সে গম মাপিত। তোমার প্রপিতামহ বড় নির্ব্বোধ ছিল, গম মাপিতে অনেক সময় ভুল করিত, তাই অনেক সময় তাহাকে লাথি ঘুসো খাইতে হইত।"

বেনে বলিল, "সত্যি বলেছ, চৌধুরী, সত্যি বলেছ।"

গল্পটা যখন এতটা বলা হইয়াছে তখন গঞ্জে জাঠের মহাজনের ঘরে বেনে ও জা
প্রবেশ করিয়াছে। উভয়েই মহাজনকে "রাম রাম" করিয়া বসিল। জাঠ তাহার গ
বলিতে লাগিল।

"সাহজি, যখন সব গম বিক্রয় হয়ে গেল, তখন তোমার প্রপিতামহ আমার
প্রপিতামহের কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া একশ টাকা ধার চাহে। তোমার প্রপিতামহে
দুরবস্থা জানিয়া আমার প্রপিতামহ দয়া করিয়া তাহাকে একশ টাকা ধার দেন।"

বেনে বলিল "সত্যি বলেছ, চৌধুরী, সত্যি বলেছ।"

"ভাল কথা সাহজি। তোমার প্রপিতামহ সে টাকাটা শোধ করে নাই।"

বেনে বলিল, "সত্যি বলেছ, চৌধুরী, সত্যি বলেছ।"

"সে ধারটা তোমার পিতামহও দেয় নাই, তোমার বাপও দেয় নাই আর তুমিও
দেও নাই।"

বেনে বলিল, "সত্যি বলেছ, সাহজি, সত্যি বলেছ।"

এখন সে একশ টাকা সুধে আসলে এক হাজার টাকা হয়েছে, সে টাকাটা তুমি
আমার ধার।"

বেনে বলিল, "সত্যি বলেছ, চৌধুরী, সত্যি বলেছ।"

জাঠ মহাজনকে ডাকিয়া বলিল, "এই আপনি শুনলেন এই বেনে আমার এক হাজার
টাকা ধারে—এই টাকাটা জমুন করে আপনাকে দিব।"

বেনের মাথায় বজ্রাঘাত। গল্প মিথ্যা বলিলেও এক হাজার টাকা দিতে হইবে—
সত্যি বলে ফেলে তো দাওয়া স্বীকারই করা হইয়াছে। বেনেজীকে এক হাজার টাক
দিতে হইল—জাঠজী মহাজনকে সে টাকা দিয়া পৈতৃক জমিটুকু খালাস করিয়া আনন্দে
ঘরে ফিরিল।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

কার্য্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশতঃ কিছুকাল হইতে বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম
ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এই জন্য পাঠকদিগের
নিকটে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। বালক-কার্য্যাধ্যক্ষ
সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—তিনি কর্ম্মিষ্ঠতা ও
কার্য্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের
ভার আছে, ভরসা করি এই সকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকেরা প্রসন্ন মনে
তাঁহাদের কার্য্যাধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।

বালক-কার্য্যাধ্যক্ষ।